

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পণ্ডিত মশাই

পন্ডিতমশাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুঞ্জ বোষ্টমের ছোট বোন কুসুমের বাল্য-ইতিহাসটা এতই বিশ্রী যে, এখন সে-সব কথা স্মরণ করিলেও, সে লজ্জায় দুঃখে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। যখন সে দু'বছরের শিশু তখন বাপ মরে, মা ভিক্ষা করিয়া ছেলে ও মেয়েটিকে প্রতিপালন করে। যখন পাঁচ বছরের, তখন মেয়েটিকে সুশ্রী দেখিয়া, বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস অধিকারী তাহার পুত্র বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ দেয়; কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পরেই কুসুমের বিধবা-মায়ের দুর্নাম উঠে, তাহাতে গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া ছেলের পুনর্বার বিবাহ দেয়।

কুসুমের মা, দুঃখী হইলেও, অত্যন্ত গর্বিতা ছিল। সেও রাগ করিয়া কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, সেই মাসেই আর একজন আসল বৈরাগীর সহিত কন্যার কন্ঠীবদল-ক্রিয়া সম্পন্ন করে; কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই এই আসল বৈরাগীটি নিত্যধামে গমন করেন। তবে ইনি কে, কোন্ গ্রামে বাড়ি, তাহা একা কুসুমের মা ছাড়া, আর কেহই জানিত না, কুঞ্জও না। তাহার মা, কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই। কন্ঠীবদল ব্যাপারটা সত্য, কিংবা শুধুই রচনা, তাহাও কেহ নিশ্চয় বলিতে পারিত না। এত কান্ড কুসুমের সাত বৎসর বয়সেই শেষ হইয়া যায়। সেই অবধি কুসুম বিধবা। সংক্ষেপে এই তাহার বাল্য-ইতিহাস। এখন সে ষোল বৎসরের যুবতী,—তাহার দেহে রূপ ধরে না। যেমনই গুণ, তেমনই কর্মপটুতা, আবার লেখাপড়াও জানে। খুব বড়লোকের ঘরেও বোধ করি তাহাকে বেমানান দেখাইত না।

এদিকে বৃন্দাবনের বাপ মরিয়াছে, দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়াছে; তাহার বয়সও পঁচিশ-ছাব্বিশের অধিক নয়। এখন সে কুসুমকে ফিরিয়া গ্রহণ করিতে চাহে। সে কুঞ্জকে পঞ্চাশ টাকা নগদ, পাঁচ জোড়া ধুতি-চাদর এবং কুসুমকে পাঁচ ভরি

সোনা ও একশ’ ভরি রূপার অলঙ্কার দিতে স্বীকৃত। দুঃখী কুঞ্জনাথ লোভে পড়িয়াছে।

তাহার বড় ইচ্ছা কুসুম সম্মত হয়; কিন্তু কুসুম সেকথা কানেও তোলে না। কেন তাহা বলিতেছি;—ইহাদের বাপ-মা নাই। ভাই-বোন যে দুখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে, তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার ভিতরেই। শিশুকাল হইতেই কুসুম ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, একত্রে হর পন্ডিতের পাঠশালে পড়িয়াছে, খেলাধূলা করিয়াছে। আজিও তাহারাই তাহার সঙ্গীসাথী। তাই এসব প্রসঙ্গেও তাহার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া উঠে। ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে বিধবা হইতে বিলম্ব হয় না। তাহার বাল্যসখীদের অনেকেই, তাহার মত হাতের নোয়া ও সিঁথির সিন্দুর ঘুচাইয়া, আবার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে; ইহারা কেহ তাহার মকর- গঙ্গাজল, কেহ সই মহাপ্রসাদ। ছি, ছি, দাদার কথায় সম্মত হইলে, এ কালামুখ কি ইহজন্মে আর এ গ্রামে সে দেখাইতে পারিবে!

কুঞ্জ কহিল, দিদি, রাজি হ। ধরতে গেলে বৃন্দাবনই তোর আসল বর।

কুসুম অত্যন্ত রাগিয়া জবাব দিল, আসল নকল বুঝিনে দাদা; শুধু বুঝি আমি বিধবা। কেন? একি কুকুর-বেড়াল পেয়েছ যে, যা-ইচ্ছে হবে, তাই করবে? এই বিয়ে, এই কণ্ঠীবদল; আবার বিয়ে, আবার কণ্ঠীবদল; যাও, ও-সব আমার সুমুখে তুল না। বাড়লের উনি আমার কেউ নয়; আমার স্বামী মরেছে, আমি বিধবা।

নিরীহ কুঞ্জ আর কথা কহিতে পারে না। তাহার এই শিক্ষিতা তেজস্বিনী ভগিনীটির সুমুখে, সে কেমন যেন থতমত খাইয়া যায়। তথাপি সে ভাবে, আর একরকম করিয়া। সে বড় দুঃখী। এই দু’খানি কুটীর এবং তৎসংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র একখানি আম-কাঁঠালের বাগান ছাড়া আর তাহার কিছু নাই। অতএব নগদ এতগুলি টাকা এবং এত জোড়া ধুতি-চাদর তাহার কাছে সোজা ব্যাপার নহে।

তবুও এই প্রলোভন ছাড়াও, সে তাহার একমাত্র স্নেহের সামগ্রীকে এই ভাল জায়গাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে সুখী দেখিয়া নিজেও সুখী হইতে চাহে।

কন্ঠীবদল তাহাদের সমাজে ‘চল’ আছে, তাই তাহার মা, ও-কাজ করিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে যখন মরিয়াছে এবং বৃন্দাবন, কুসুমের স্বামী যখন এত সাধাসাধি করিতেছে, তখন, কেন যে কুসুম এত বড় সুযোগের প্রতি দৃক্পাত করিতেছে না, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া পায় না। শুধু সমাজের ফৌজদার ও ছড়িদারের মত লইয়া কিছু মালসা-ভোগ দেওয়া। ব্যয়ভার সমস্তই বৃন্দাবন বহিবে; তারপর এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া, একেবারে রাজরানী হইয়া বসিবে। কুসুম কি বোকা! আহা, সে যদি কুসুম হইতে পারিত! এমনই করিয়া কুঞ্জ প্রতিদিনই চিন্তা করে।

কুঞ্জ ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে। একটি বড় ধামায় ঘুন্সি, মালা, চিরুনি, কৌটা, সিন্দুর, তেলের মসলা, শিশুদের জন্য ছোট-বড় পুতুল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য এবং কুসুমের হাতের নানাবিধ সূচের কারুকার্য ইত্যাদি মাথায় লইয়া পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরি করিয়া বেড়ায়। সমস্ত দিন বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, দিনান্তে সেই পয়সাগুলি বোনটির হাতে আনিয়া দেয়। ইহা দ্বারা কেমন করিয়া কুসুম মূলধন বজায় রাখিয়া যে সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া দেয়, ইহা সে বুঝিতেও পারে না—পারিবার চেষ্টাও করে না।

আজ সকালে সে ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়লে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পথে বৃন্দাবনের সহিত দেখা; সে মাঠে কাজে যাইতেছিল, আর গেল না। স্বজাতি এবং কুটুম্বকে মহাসমাদরে বাড়িতে ধরিয়া আনিল; হাত-পা ধুইতে জল দিল এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া খাতির করিল। দ্বিপ্রহরে তাহার মা নানাবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা কুঞ্জকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইলেন, এবং এত রৌদ্রে কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ ঘরে ফিরিয়া হাত-পা ধুইয়া, মুড়ি-মুড়কি চিবাইতে চিবাইতে সেই সব কাহিনী ভগিনীর কাছে বিবৃত করিয়া, শেষে কহিল, হাঁ, একটা গেরস্থ বটে! বাগান, পুকুর, চাষবাস, কোন জিনিসটির অভাব নেই—মা-লক্ষ্মী যেন উথলে পড়ছেন।

কুসুম চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিয়া, বৃন্দাবনের মা কি রাঁধিয়াছিলেন এবং কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিয়া কহিল, খাইয়ে দাইয়েই কি ছেড়ে দিতে চায়! বলে, এত রোদ্দুরে বেরুলে মাথা ধরে অসুখ করবে।

কুসুম দাদার মুখের দিকে চাহিয়া, একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাহলে দাদা বুঝি সারাদিনি এই কর্ম্মই করেছ? খেয়েচ আর ঘুমিয়েচ?

তাহার দাদাও সহাস্যে জবাব দিল, কি করি বল বোন! ছেড়ে না দিলে তো আর জোর করে আসতে পারিনে?

কুসুম কহিল, তাহলে ও গাঁয়ে আর কোনদিন যেও না।

কুঞ্জ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল, যাব না! কেন?

পথে দেখা হলেই ত ধরে নিয়ে যাবে। তারা বড়লোক, তাদের ক্ষতি নেই; কিন্তু আমাদের তাহলে ত চলবে না দাদা!

ভগিনীর কথায় কুঞ্জ ক্ষুণ্ণ হইল।

কুসুম তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, সে কথা বলিনি দাদা—সে কথা বলিনি; দু'একদিনে আর কি লোকসান হবে। তা নয়; তবে তারা বড়মানুষ, আমরা দুঃখী; কাজ কি দাদা তাদের সঙ্গে বেশি মেশামিশি করে?

কুঞ্জ জবাব দিল, আমি তাদের ঘরে ত যেচে যাইনি, কুসুম!

তা যাওনি বটে; তবু ডেকে নিয়ে গেলেই বা যাবার দরকার কি দাদা?

তুই যে এই বামুন-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিস তারাও ত সব বড়লোক, তবে যাস কেন?

কুসুম দাদার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, তাদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই খেলা করি; তা ছাড়া তারা আমাদের জাতও নয়, সমাজও নয়! এখানে আমাদের লজ্জা নেই; কিন্তু ওদের কথা আলাদা।

কুঞ্জ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, সেখানেও লজ্জা নেই। মা-লক্ষী তাঁদের দয়া করেছেন, দু' পয়সা আছে সত্য; কিন্তু এতটুকু দেমাক অহঙ্কার নেই—সবাই যেন মাটির মানুষ! বৃন্দাবনের মা আমার হাত দুটি ধরে যেমন করে—

কথাটা শেষ হইল না, মাঝখানেই কুসুম বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া বলিল উঠিল, আবার সেইসব পুরোনো কথা! মায়ের নামে ওরা যে এত বড় কলঙ্ক তুলেছিল, দাদা বুঝি ভুলে বসে আছ!

কুঞ্জ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তারা একটা কথাও তোলেনি। বদ লোকে হিংসে করে বদনাম দিয়েছিল।

কুসুম কহিল, তাই ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করেছিল—কেমন?

কুঞ্জ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তা বটে, তবে কিনা তাতে বৃন্দাবন বেচারীর একটুও দোষ ছিল না। বরং তার বাপের দোষ ছিল।

কুসুম একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তভাবে বলিল, যার দোষই থাক দাদা—যা হয় না, হবার নয়, দরকার কি একশ' বার সেই সব কথা তুলে? আমি পারিনে আর তর্ক করতে।

কুঞ্জ প্রথমটা জবাব দিতে পারিল না, পরে একটু রুষ্টস্বরেই বলিল, তুই ত তর্ক করতে পারিস নে; কিন্তু আমাকে যে সব দিক দেখতে হয়! আজ আমি ম'লে তোর দশা কি হবে, তা একবার ভাবিস?

কুসুম বিরক্ত হইয়াছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ গম্ভীরমুখে কহিতে লাগিল, আমি আমাদের মুরুব্বিদের সবাইকে জিজ্ঞেস করেচি, তোর শাউড়ি নলডাঙ্গার বুড়ো বাবাজীর মত পর্যন্ত জেনে এসেছে, সবাই খুশি হয়ে মত দিয়েচে, তা জানিস?

কুসুমের মুখের ভাব সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সংক্ষেপে, জানি বৈ কি!–বলিয়াই চুপ করিয়া গেল।

তাহার কথা লইয়া, তাহার মায়ের কথা লইয়া, তাহার কণ্ঠীবদলের কথা লইয়া, তাহাদের সমাজে আলোচনা

চলিতেছে, গণ্যমান্যদিগের মত জানাজানি চলিতেছে,–এ সংবাদ তাহাকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল; কিন্তু এ ভাব চাপা দিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, এ বেলা কি খাবে দাদা?

কুঞ্জ বোনের মনের ভাব বুঝিল, সেও মুখ ভারী করিয়া বলিল—কিছু না। আমার ক্ষিদে নেই।

কুসুম অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাও সংবরণ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ এক কলিকা তামাক সাজিয়া লইয়া সেইখানে বসিয়া তামাকটা নিঃশেষ করিয়া হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া ডাক দিল, কুসুম!

কুসুম তাহার ঘরের মধ্যে সিলাই করিতে বসিয়াছিল–সাড়া দিল, কেন?

বলি রাত্তির হচ্ছে না? রাঁধবি কখন?

কুসুম তথা হইতে জবাব দিল, আজ আর রাঁধবো না.

কেন? তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।

কুসুম চেঁচাইয়া বলিল আমি এক শ বার বকতে পারিনে।

বোনের কথা শুনিয়া কুঞ্জ দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। চেঁচাইয়া বলিল, জ্বালাতন করিস নে কুসি! অমনধারা করলে যেখানে দু’চোখ যায় চলে যাব, তা বলে দিচ্চি।

যাও—এক্ষুণি যাও। বাড়ির মধ্যে আমি হাড়ী-ডোমের মত অমন করে হাঁকাহাঁকি করতে দেব না। ইচ্ছা হয় যাও, ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যত পার চেঁচাও গে।

কুঞ্জ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, পোড়ারমুখী, তুই ছোটবোন হয়ে বড়ভাইকে তাড়িয়ে দিস?

কুসুম বলিল, দিই। বড় বলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে নাকি?

বোনের মূখের পানে চাহিয়া কুঞ্জ মনে মনে একটু ভয় পাইল। গলা নরম করিয়া বলিল, কিসে যা ইচ্ছে করলুম শুনি?

কেন তবে আমাকে না বলে ওখানে গিয়ে খেয়ে এলে?

কেন—তাতে দোষ কি হয়েছে?

কুসুম তীব্রভাবে বলিল, দোষ হয়েচে। ঢের দোষ হয়েচে। আমি মানা করে দিচ্ছি, আর তুমি ওখানে যাবে না।

কুঞ্জ বড়ভাই, কলহের সময় নতি স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা করিল, কহিল, তুই কি বড়বোন যে, আমাকে হুকুম করবি? আমার ইচ্ছে হলেই সেখানে যাব।

কুসুম তেমনি জোর দিয়া বলিল, না, যাবে না। আমি শুনতে পেলে ভাল হবে না বলে দিচ্চি দাদা!

এবার কুঞ্জ যথার্থ ভয় পাইল। তথাপি মুখের সাহস বজায় রাখিয়া বলিল, যদি যাই কি করবি তুই?

কুসুম সিলাই ফেলিয়া দিয়া তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আমাকে রাগিও না বলছি দাদা—যাও আমার সুমুখ থেকে—সরে যাও বলছি।

কুঞ্জ শশব্যস্তে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোর ভয়ে সরে যাব? যদি না যাই, কি করতে পারিস তুই?

কুসুম জবাব দিল না; প্রদীপের আলোটা আরো একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সিলাই করিতে বসিল।

আড়ালে দাঁড়াইয়া কুঞ্জর সাহস বাড়িল, কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া বলিল, লোকে কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে'। নিজে রাক্ষসীর মত চেঁচাবি, তাতে দোষ নেই; কিন্তু আমি একটু জোর কথা কইলেই—বলিয়া কুঞ্জ থামিল; কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে প্রতিবাদ আসিল না দেখিয়া, সে মনে মনে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। উঠিয়া গিয়া হুঁকাটা তুলিয়া আনিয়া নিরর্থক গোটা-দুই টান দিয়া, গলার সুর আর এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, আমি যখন বড়, আমি যখন কর্তা, তখন আমার হুকুমেই কাজ হবে। বলিয়া পোড়া তামাকটা ঢালিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া সাজিতে সাজিতে, এবার রীতিমত জোর গলায় হাঁকিয়া কহিল, চাইনে আমি কারো কথা, এক শ' বার না-না শুনতে আমি চাইনে! আমি যখন কর্তা—আমার যখন বাড়ি—তখন আমি যা বলব তাই—বলিয়া সে সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় বাঁকাইয়াই স্তব্দ হইয়া থামিল।

কুসুম নিঃশব্দে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল; বলিল, বসে বসে কোঁদল করবে, না যাবে এখান থেকে?

ছোটবোনের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুমুখের বড়ভাইয়ের কর্তা সাজিবার শখ উড়িয়া গেল। তাহার গলা দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। কুসুম তেমনিভাবে বলিল, দাদা, যাবে কি না?

এখন সে কুঞ্জনাথও নাই, সে গলাও নাই; চিঁচিঁ করিয়া বলিল, বললুম ত, তামাকটা সেজে নিয়েই যাচ্চি।

কুসুম হাত বাড়াইয়া, দাও আমাকে, বলিয়া কলিকাটা হাতে লইয়া চলিয়া গেল। মিনিটখানেক পরে, ফিরিয়া আসিয়া, সেটা হুঁকার মাথায় রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, স্যাকরাদের দোকানে যাচ্চ ত?

কুঞ্জ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

কুসুম সহজভাবে বলিল, তাই যাও। কিন্তু বেশি রাত কর না, আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না।

কুঞ্জ হুঁকাটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন কুঞ্জ ভগিনীর কাছে বৃন্দাবনের সাংসারিক পরিচয় দিবার সময় অত্যুক্তি মাত্র করে নাই। সত্যই তাহাদের গৃহে লক্ষ্মী উথলিয়া পড়িতেছিল; অথচ সেজন্য কাহারও অহঙ্কার অভিমান কিছুই ছিল না।

এ গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। বৃন্দাবন ছেলেবেলায় নিজের চেষ্টায় বাংলা লেখাপড়া শেখে এবং তখন হইতেই একটা পাঠশালা খুলিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু তাহার পিতা গৌরদাস পাকা লোক ছিলেন; বৃন্দাবন একমাত্র সন্তান হইলেও, এইসব অনাসৃষ্ট কার্যে পুত্রকে প্রশয় দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সে নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিনা-বেতনের একটা পাঠশালা খুলিয়া সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করে।

পাড়ায় একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাকে সে নিজের ইংরাজী শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করে। তিনি রাত্রে পড়াইয়া যাইতেন; তাই কথাটা গোপনেই ছিল। গ্রামে কেহই জানিতে পারে নাই—বেন্দা বোষ্টম ইংরাজী শিখিয়াছিল। বছর-পাঁচেক পূর্বে, স্ত্রীবিয়োগের পর, সে এই লেখাপড়া লইয়াই থাকিত। প্রায় সমস্ত রাত্রি পড়িত, সকালে গৃহকর্ম, বিষয়-আশয় দেখিত; এবং দুপুরবেলা স্ব-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালে কৃষক-পুত্রদিগের অধ্যাপনা করিত। বিধবা জননী তাহাকে পুনরায় বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে তাহার শিশুপুত্রটিকে দেখাইয়া বলিত, যে জন্য বিয়ে করা তা আমাদের আছে; আর আবশ্যক নেই না।

মা কান্নাকাটি করিতেন, কিন্তু সে শুনিত না। এমনই করিয়া বছর-দুই কাটিল।

তারপর, হঠাৎ একদিন সে কুঞ্জ বোষ্টমের বাড়ির সুমুখেই কুসুমকে দেখিল। কুসুম নদী হইতে স্নান করিয়া কলসকক্ষে ঘরে ফিরিতেছিল; সে তখন

সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে। বৃন্দাবন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল; কুসুম গৃহে প্রবেশ করিলে সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। এ গ্রামের সব বাড়িই সে চিনিত; সুতরাং এই কিশোরী যে কে, তাহাও সে চিনিল।

এক সন্তান হইলে মাতাপুত্রে যে সম্বন্ধ হয়, বৃন্দাবন ও জননীর মধ্যে সেই সম্বন্ধ ছিল। সে ঘরে ফিরিয়া মায়ের কাছে কুসুমের কথা অবাধে প্রকাশ করিল। মা বলিলেন, সে কি হয় বাবা? তাদের যে দোষ আছে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, তা হউক মা, তবু সে তোমার বৌ। যখন বিয়ে দিয়েছিলে, তখন সে কথা ভাবনি কেন?

মা বলিলেন, সেসব কথা তোমার বাবা জানতেন। তিনি যা বুঝেছিলেন—করে গেছেন।

বৃন্দাবন অভিমানভরে কহিল, তবে তাই ভাল মা। আমি যেমন আছি, তেমনিই থাকি; আমার বিয়ের জন্য তুমি আর পীড়াপীড়ি করো না। বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

তখন হইতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে ঘরে আনিবার জন্য অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ফল হয় নাই—কুসুমকে কোনমতেই সম্মত করান যায় নাই। কুসুমের এত দৃঢ় আপত্তির দুটো বড় কারণ ছিল। প্রথম কারণ—সে তাহার নিরীহ অসমর্থ ও অল্পবুদ্ধি ভাইটিকে একা ফেলিয়া আর কোথাও গিয়াই স্বস্তি পাইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ পূর্বেই বলিয়াছি। আর কোনরূপ সামাজিক ক্রিয়া না করিয়া সে যদি সহজে গিয়া স্বামীর ঘর করিতে পাইত, হয়ত এমন করিয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন দাদার অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত না। কিন্তু ঐ যে আবার কি-সব করিতে হইবে, রকমারি বোষ্টমের দল আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার মায়ের মিথ্যা কলঙ্কের কথা, তাহার নিজের বাল্যজীবনের বিস্তৃত ঘটনা, আরও কত কি ব্যাপারের উল্লেখ হইবে, চেঁচামেচি উঠিবে, পাড়ার লোক কৌতুহলী হইয়া দেখিতে

আসিবে, তাহার সঙ্গিনীদের সকৌতুক-দৃষ্টি বেড়ার ফাঁক দিয়া নিঃসংশয়ে উঁকিঝুঁকি মারিবে, শেষে ঘরে ফিরিয়া গিয়া সোজা ভাষায় হাসিতে হাসিতে বলিবে, হাড়ী-ডোমের মত কুসুমেরও নিকা হইয়া গেল। ছি ছি, এ-সব মনে করিলেও সে লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠে। যে-সব ভদ্রকন্যাদের সহিত সেও লেখাপড়া শিখিয়াছে, একসঙ্গে একভাবেই এত বড় হইয়াছে, দরিদ্র হইলেও আচার-ব্যবহারে তাহাদের অপেক্ষা সে যে ছোট এ কথা সে মনে ঠাঁই দিতেও পারে না।

কাল সন্ধ্যায় দাদার সহিত কুসুমের কলহ হইয়াছিল, রাগ করিয়া কাঠের সিন্দুকের চাবিটা সে দাদার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সরোষে বলিয়াছিল, আর সে সংসারের কিছুতেই থাকিবে না। আজ প্রভাতে নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া দেখিল, দাদা ঘরে নাই, চলিয়া গিয়াছে। তাহার ধামাটিও নাই। কুসুম মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, কাল বকুনি খেয়েই দাদা আজ ভোরে উঠে পালিয়েচে। কল্যকার ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্যই সে পলাইয়াছে, তাহা সত্য বটে। কিন্তু কুসুম যাহা অনুমান করিল তাহা নহে, সে ত্রুটি আর একটা। খানিক পরেই তাহা প্রকাশ পাইল।

কুসুমকে প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহকর্ম করিতে হইত। ঘর-দুয়ার গোময় দিয়া নিকাইয়া, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া, নদী হইতে স্নান করিয়া জল আনিয়া, তবে দাদার জন্য রাঁধিয়া দিতে হইত। কুঞ্জ ভাত খাইয়া ফেরি করিতে বাহির হইয়া গেলে সে পূজা-আহ্নিকে বসিত। যেদিন কুঞ্জ না খাইয়া যাইত, সেদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ফিরিয়া আসিত। তাহার এখনও অনেক দেরি মনে করিয়া কুসুম ফুল তুলিতে লাগিল। উঠানের একধারে কয়েকটা ফুলের গাছ, গোটা-কয়েক মল্লিকা ও যুঁই-এর ঝাড় ছিল, ইহারাই তাহার নিত্যপূজার ফুল যোগান দিত। ফুল তুলিয়া, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া লইয়া সবেমাত্র পূজায় বসিয়াছে—এমন সময় সদরে কয়েখানা গোযান আসিয়া থামিল এবং পরক্ষনেই একটি প্রৌঢ়া নারী কপাট ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত

উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কুসুম ইঁহাকে আর কখনও দেখে নাই, কিন্তু নাকে তিলক, গলায় মালা দেখিয়া বুঝিল, যেই হ'ন, স্বজাতি।

প্রৌঢ়া কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, তুমি আমাকে চেন না মা, তোমার দাদা চেনে। কুঞ্জনাথ কৈ?

কুসুম জবাব দিল, তিনি আজ ভোরেই বাইরে গেছেন। ফিরতে বোধকরি দেরি হবে।

আগন্তুক বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, দেরি হবে কি গো!

কাল সে তার ভগিনীপতিকে, আরো চার-পাঁচটি ছেলেকে—তারাও আমাদের আপনার লোক—সম্পর্কে ভাগনে হয়—সবাইকে খেতে বলে এলো—আমিও তাই আজ সকালে বললুম, বৃন্দাবন, গরুর গাড়িটা ঠিক করে আনতে বলে দে বাছা; যাই, আমিও বৌমাকে একবার দেখে আশীর্বাদ করে আসি।

কথা শুনিয়া কূসুম স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, মাথার আঁচলটা আরো খানিকটা টানিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল, এবং ঘরের ভিতর হইতে আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম বুঝিল ইনি শাশুড়ি। তিনি আসনে বসিয়া হাসিয়া বলিলেন, কাল খাওয়াদাওয়ার পর বৃন্দাবন তামাশা করে বললে—আমি এমনিই হতভাগা যে, কুঞ্জদা বড়ভাই-এর মত হয়েও, কোনদিন ডেকে এক ঘটি জ়ল পর্যন্ত খেতে বললেন না। ক'দিন থেকে আমার ননদের ছেলেরাও সব এখানে আছে—কুঞ্জনাথ হাসতে হাসতে তাই সকলকে নেমতন্ন করে এল—তারা সবাই এলো বলে।

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনের মা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মত ছিলেন না—তাঁর বুদ্ধি-সুদ্ধি ছিল; কুসুমের ভাব দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল, কি যেন একটা

গোলমাল ঘটিয়াছে। সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ বৌমা,কুঞ্জনাথ কি তোমাকে কিছু বলে যায়নি!

কুসুম ঘোমটার ভিতরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

কিন্তু ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বরং মনে করিলেন, সে বলিয়াই গিয়াছে। তাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তবু ভালো, তার পর কুঞ্জনাথকে উদ্দেশ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, ভয় হয়েছিল—আমার পাগলা ছেলেটা বুঝি সব ভুলে বসে আছে! তবে বোধ করি, সে কিছু কিনতে-টিনতে গেছে, এক্ষুনি এসে পড়বে। ঐ যে—ওরাও সব হাজির।

কুঞ্জদা, বলিয়া বৃন্দাবন একটা হাঁক দিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে তাহার আরও তিনটি ছেলে—ইহারই মামাতো ভাই।

তাহার মা বলিলেন, কুঞ্জনাথ এইমাত্র কোথায় গেল। বৌমা, ঘরের ভিতরে একটা সতরঞ্চি পেতে দাও বাছা –ওরা বসুক |

কুসুম ব্যস্ত হইয়া তাহার দাদার ঘরের মেঝেতে একটা কম্বল পাতিয়া দিয়া, কলিকাটা হাতে লইয়া তামাক সাজিয়া আনিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন দেখিতে পাইয়া সহাস্যে কহিল, ও থাক। তামাক আমরা কেউ খাইনে।

কুসুম কলিকাটা ফেলিয়া দিয়া এইবার রান্নাঘরের একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কান্ডজ্ঞানহীন মূর্খ অগ্রজ অকস্মাৎ একি বিপদের মাঝখানে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধে, অভিমানে, লজ্জায়, অবশ্যম্ভাবী অপমানের আশঙ্কায়, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কাল হইতেই তাহার ভাঁড়ারে সমস্ত জিনিস বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকালে স্নানে যাইবার পূর্বেও সে ভাবিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়াই দাদাকে হাটে পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া, আর দাদার সন্ধান পায় নাই। দোষ অপরাধ করার পরে, ছোটবোনকে কুঞ্জ যথার্থই এত ভয় করিত যে, সচরাচর মানুষ দুষ্ট

মনিবকেও এত করে না। যে বড়লোকদের ঘরে শুধু খাইয়া আসিবার অপরাধে কুসুম এত রাগ করিয়াছিল, ঝোঁকের মাথায়—সেই বড়লোকদিগকে সদলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার গুরুতর অপরাধ মুখ ফুটিয়া বলিবার দুঃসাহস কুঞ্জ কোনমতেই নিজের মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। পারে নাই বলিয়াই সে সকালে উঠিয়াই পলাইয়াছে, এবং কিছুতেই সে রাত্রির পূর্বে ফিরিবে না, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াই কুসুম আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সবচেয়ে বিপদ হইয়াছিল, যে সিন্দুকটির ভিতরে তাহাদের সঞ্চিত গুটি-কয়েক টাকা ছিল, তাহার চাবিটাও কাছে নাই; অথচ হাতেও একটি পয়সা নাই।

এখন নিরুপায়ভাবে মিনিট-পাঁচেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হঠাৎ তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বৃন্দাবনের উপরে; বাস্তবিক সমস্ত দোষ ত তাহারই। কেন সে তাহার নির্বোধ নিরীহ ভাইটিকে পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গেল, কেনই বা এইসব পরিহাস করিল! উনি কে যে, দাদা ওঁকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইবে?

এই তিন বৎসর কত ছলে, কত উপলক্ষে বৃন্দাবন এদিকে যাতায়াত করিয়াছে; কত উপায়ে তাহাদের মন পাইবার চেষ্টা করিয়াছে; কতদিন সকাল-সন্ধ্যায়, বিনা প্রয়োজনে বাটীর সম্মুখের পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে। তাহাদের দুঃস্থ অবস্থার কথা সে সমস্ত জানে; জানে বলিয়াই, তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার এই কৌশল সৃষ্টি করিয়াছে।

কুসুম কাঠের মূর্তির মত সেইখানে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে বড় অভিমানিনী; এখন একা সে কি উপায় করিবে?

বৃন্দাবনের মা ঘরের ভিতরে উঠিয়া গিয়া, ছেলেদের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন; কিন্তু তাঁর ছেলের চোখ ঘরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে দৃষ্টি রান্নাঘরের ভিতরে কুসুমের উপর পড়িল—চোখাচোখি হইল, মনে হইল, সে সঙ্কেতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল। পলকের এক অংশের জন্য তাহার

সমস্ত হৃৎপিণ্ড উন্মত্তের মত লাফাইয়া উঠিয়াই স্থির হইল। সে বুঝিল, ইহা চোখের ভুল; ইহা অসম্ভব।

দৈবাৎ কখন দেখা হইয়া গেলে যে মানুষ মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়াছে, যাহার নিদারুণ বিতৃষ্ণার কথা সে অনেকবার কুঞ্জনাথের কাছে শুনিয়াছে, সে যাচিয়া তাহাকে আহ্বান করিবে—এ হইতেই পারে না। বৃন্দাবন অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল; কিন্তু থাকিতেও পারিল না। যেখানে চোখাচোখি হইয়াছিল, আবার সেইখানেই চাহিল। ঠিক তাই! কুসুম তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, হাত নাড়িয়া ডাকিল।

ত্রস্তপদে বৃন্দাবন উঠিয়া আসিয়া, রান্নাঘরের কপাটের কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাকছিলে আমাকে?

কুসুম তেমনই মৃদুকণ্ঠে বলিল, হুঁ।

বৃন্দাবন আরো একটু সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কুসুম একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া, ভারী চাপা গলায় বলিল, জিজ্ঞেস কচ্চি তোমাকে, আমাদের মত দীন-দুঃখীকে জব্দ করে, তোমার মত বড়লোকের কি বাহাদুরি বাড়বে?

হঠাৎ এ কি অভিযোগ! বৃন্দাবন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম অধিকতর কঠোরভাবে বলিল, জান না, আমাদের কি করে দিন চলে? কেন তবে তুমি দাদাকে অমন তামাশা করতে গেলে? কেন এত লোক নিয়ে খেতে এলে?

বৃন্দাবন প্রথমে ভাবিয়া পাইল না, এই নালিশের কি জবাব দিবে; কিন্তু স্বভাবতঃ সে ধীর প্রকৃতির লোক। কিছুতেই বেশি বিচলিত হয় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, শেষে সহজ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কুঞ্জদা কোথায়?

কুসুম বলিল, জানিনে। আমাকে কোন কথা না বলেই তিনি সকালে উঠে চলে গেছেন।

বৃন্দাবন আর একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, গেলই বা। সে নেই, আমি আছি। ঘরে খেতে দেবার কিছু নেই

নাকি?

কিছু না; সব ফুরিয়েচে, আমার হাতে টাকাও নাই।

বৃন্দাবন কহিল, এ-গাঁয়ে তোমাদের মত আমাকেও সবাই জানে। আমি মুদির হাতে সমস্ত কিনে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমাকে একটা গামছা দাও—আমি একেবারে স্নান করে ফিরে আসব। মা জিজ্ঞেস করলে বল আমি নাইতে গেছি। দাঁড়িয়ে থেক না—যাও।

কুসুম ঘরে গিয়া তাহার গামছা আনিয়া হাতে দিল।

সেটা মাথায় জড়াইয়া লইয়া বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, কুঞ্জদার তুমি বোন হও, তাই সে পালাতে পেরেচে; আর কিছু হলে বোধ করি, এমন করে ফেলে যেতে পারত না।

কুসুম চুপি চুপি জবাব দিল, সবাই পারে না বটে, কিন্তু কেউ কেউ তাও বেশ পারে। বলিয়াই সে বৃন্দাবনের মুখের প্রতি আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, কথাটা তাহাকে বাস্তবিক কিরূপ আঘাত করিল।

বৃন্দাবন যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, থামিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তোমার এ ভুল হয়ত একদিন ভাঙ্গতেও পারে। ছেলেবেলায় তোমার মায়ের অন্যায়ের জন্য যেমন তুমি দায়ী নও, আমার বাবার ভুলের জন্যেও তেমনই আমার দোষ নাই। যাক, এ-সব ঝগড়ার এখন সময় নয়, যাও–রাঁধবার যোগাড় কর গে।

রাঁধবার কি যোগাড় করব শুনি? আমার মাথাটা কেটে রেঁধে দিলে যদি তোমার পেট ভরে, না হয় বল, তাই দিই গে।

বৃন্দাবন দু-এক পা গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া এ-কথার জবাব না দিয়া কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলতে পার, আমাকে তা সইতেই হবে, কিন্তু রাগের মাথায় তোমার শাশুড়িঠাকরুনকে যেন কটু কথা শুনিয়ে দিও না। তিনি অল্পেই বড় আঘাত পান।

কুসুম ক্রুদ্ধ চাপা গলায় ফিসফিস করিয়া বলিল, আমি জন্তু নই, আমার সে-বুদ্ধি আছে।

বৃন্দাবন কহিল, সেও জানি, আবার বুদ্ধির চেয়ে রাগ তোমার ঢের বেশি তাও জানি। আর একটা কথা কুসুম! মা স্নান করেই চলে এসেছেন, এখনও পূজা-আহ্নিক করেন নি। তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আগে সেই যোগাড়টা করে দাও গে, আমি চললুম।

যাও, কিন্তু কোথাও গল্প করতে বসে যেও না যেন।

বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া বলিল, না। কিন্তু দেরি করে বকুনি খাবারও ভারী লোভ হচ্চে। আর একদিনের আশা দাও ত আজ না হয় শিগ্গির করে ফিরে আসি।

সে তখন দেখা যাবে, বলিয়া কুসুম রান্নাঘরের ভিতরে যাইতেছিল, সহসা বৃন্দাবন একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, আশ্চর্য! একবার মনে হল না যে, আজ তুমি এই প্রথম কথা কইলে। যেন কত যুগযুগান্তর আমাকে তুমি এমনি শাসন করে এসেছ—ভগবানের হাতে বাঁধা কি আশ্চর্য বাঁধন কুসুম।

কুসুম দাঁড়াইয়া শুনিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বৃন্দাবন চলিয়া গেলে এই কথা স্মরণ করিয়া হঠাৎ তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, সে রান্নাঘরের ভিতরে আসিয়া স্থির হইয়া বসিল। নিজের শিক্ষার অভিমানে, তাহাকে সে এতদিন অশিক্ষিত চাষা মনে করিয়া গণনার মধ্যেই আনে নাই, আজিকার কথাবার্তা এবং এই ব্যবহারের পর, তাহারই সম্বন্ধে এক নূতন আনন্দে নূতন তৃষ্ণায় সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে বাটী ফিরিবার সময় বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে কাছে ডাকিয়া অশ্রু-গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, বৌমা, কি আনন্দে যে সারাদিন কাটালুম, তা মুখে বলতে পারিনে। সুখী হও মা! বলিয়া তিনি অঞ্চলের ভিতর হইতে একজোড়া সোনার বালা বাহির করিয়া স্বহস্তে তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন।

আজিকার সমস্ত আয়োজন কুসুম গোপনে বৃন্দাবনের সাহায্যে নির্বাহ করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ইহাতেই তাঁহার হৃদয় আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কুসুম গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্বশ্রু-বধূতে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না, গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া তিনি বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কুঞ্জনাথের সঙ্গে দেখা হল না মা, পাগলা কোথায় সারাদিন পালিয়ে রইল, কাল তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

কুসুম ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবনের পিতামহ বাটীতে গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ঘরে বসিয়া বৃন্দাবনের মা প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্যন্ত মালা জপ করিতেন। আজিও করিতেছিলেন। তাঁহার শিশু পৌত্র কোলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহারা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানটায় প্রদীপের ছায়া পড়িয়াছিল ; সেই হেতু বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিয়া ইহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে বেদীর সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া জানু পাতিয়া বসিল এবং কিছু মনে মনে প্রার্থনা করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই এইবার মায়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল, অমন আবছায়ায় বসে কেন মা?

মা সস্নেহে বলিলেন, তা হোক। আয়, তুই আমার কাছে এসে একটু বস।

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া বসিল।

তাহার লজ্জা পাইবার কারণ ছিল। তখন রাত্রি এক প্রহরের অধিক হইয়াছিল। এমন অসময়ে কোনোদিন সে ঠাকুর-প্রণাম করিতে আসে না। আজ আসিয়াছিল—যে আশাতীত সৌভাগ্যের আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, দিনটা সার্থক বোধ হইয়াছিল, তাহাই নম্রহৃদয়ে, গোপনে, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া দিতে। কিন্তু পাছে মা তাহার মনের কথাটা অনুমান করিয়া থাকেন, এই লজ্জাতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

খানিক পরে মা নিদ্রিত পৌত্রের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে উচ্ছ্বসিত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, মা-মরা আমার এই একফোঁটা বংশধরকে ফেলে রেখে কোথাও আমি এক-পা নড়তে পারিনে, তাই আজ মনে হচ্ছে বৃন্দাবন, আমার মাথা থেকে কে যেন ভারী বোঝা নিয়ে নামিয়েচে। তাকে শিগ্গির ঘরে আন বাছা, আমি মায়ের হাতে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে একটু ছুটি নিই – দিন-কতক কাশী-বৃন্দাবন করে বেড়াই।

আজ বৃন্দাবনের অন্তরেও আশা ও বিশ্বাসের এমনি স্রোতই বহিতেছিল, তথাপি সে সলজ্জ হাস্যে কহিল, সে আসবে কেন মা?

মা নিঃসন্দিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, আসবে বৈ কি! সে এলে তবে ত আমার ছুটি হবে। আমারই ভুল হয়েছে বৃন্দাবন, এতদিন আমি নিজে যাইনি। আসবার সময় নিজের হাতের বালা দু'গাছি পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলুম, বৌমা পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। তখন বুঝেছি, আমার মাথার ভার নেমে গেছে। তুই দেখিস দিকি, প্রথম যেদিন একটা ভাল দিন পাব, সেইদিনেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনব।

বৃন্দাবন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এসে তোমার বংশধরটিকে দেখবে ত?

মা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, দেখবে বৈ কি! সে ভয় আমার নেই।

কেন নেই মা?

মা বলিলেন, আমি সোনা চিনি বৃন্দাবন। অবশ্য খাঁটি কিনা, এখন বলতে পারিনে, কিন্তু পেতল নয়, গিলটি নয়, একথা তোকে আমি নিশ্চয় বলে দিলুম। তা নইলে আমার সংসারে তাকে আনবার কথা তুলতুম না। হাঁ রে বৃন্দাবন, বৌমা কি তোর সঙ্গে বরাবরই কথা ক'ন?

কোনদিন নয় মা। তবে আজ বোধ করি বিপদে পড়েই, —বলিয়া বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া চুপ করিল।

মা একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে ঠিক কথা বাছা। তার দোষ নেই; সবাই এমনই। মানুষ বিপদে পড়লেই তখন যথার্থ আপনার জনের কাছে ছুটে আসে। আমি ত মেয়েমানুষ বৃন্দাবন, তবুও সে তার দুঃখের কথা আমাকে জানায়নি, তোকেই জানিয়েচে।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আমার আর একটা কাজ রইল, সেটা কুঞ্জনাথকে সংসারী করা, বলিয়াই তিনি নিজের মনে হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, সে বেশ লোক, পাড়াসুদ্ধ নেমন্তন্ন করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল—তার পর যা হয় তা হোক।

বৃন্দাবনও নি:শব্দে হাসিতে লাগিল।

মা বলিলেন, শুনলুম, বৌমাকে সে ভারী ভয় করে—বড় ভাই হয়েও ছোট ভাইটির মতই আছে। এক-একজন রাশভারী মানুষ আছে বৃন্দাবন, তাদের ভয় না করে থাকবার জো নেই—তা বয়সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক। আমার বৌমাও সেই ধাতের মানুষ—শান্ত, অথচ শক্ত। এমনি মানুষই আমি চাই, যে

ভার দিলে ভার সইতে পারবে। তবেই ত আমি সংসার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার বেরিয়ে পড়তে পারব।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া তখনি বলিয়া উঠিলেন, একটি দিনের দেখায় তাকে কি যে ভালবেসেচি, তা আমি তোকে মুখে বলতে পারব না, —সারা সন্ধ্যেবেলাটা কেবল মনে হয়েছে, কতক্ষণে ঘরে নিয়ে আসব, আবার কতক্ষণে দেখব।

বৃন্দাবনের মনে মনে লজ্জা করিতে লাগিল, সে কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, কুঞ্জদার কথা কি বলছিলে মা?

মা বলিলেন, হাঁ, তার কথা। বৌমাকে নিয়ে আসার আগে কুঞ্জনাথকে সংসারী করাও আমার একটা কাজ। কাল খুব ভোরে তুই গোপালকে গাড়ি আনতে বলে দিস, আমি একবার নলডাঙ্গায় যাব। ওখানে গোকুল বৈরাগীর মেয়েকে আমার বেশ পছন্দ হয়। দেখতে শুনতেও মন্দ না; তা ছাড়া—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বে বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, তা ছাড়া ঐ এক মেয়ে, বৈরাগীও কিছু বিষয়-আশয় রেখে মরেচে, না মা?

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, সে-কথা সত্যি বাছা। কুঞ্জর পক্ষে সবচেয়ে দরকার। নইলে বিয়ে করলেই ত হয় না, খেতে পরতে দেওয়া চাই। আর মেয়েটিই বা মন্দ কি বৃন্দাবন, একটু কালো, কিন্তু মুখশ্রী আছে। যাই হোক, দেখি কাল কি করে আসতে পারি।

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া বলিল, আমিও দিনক্ষণ দেখাই গে মা। তুমি নিজে যখন যাচ্চ, তখন শুধু যে ফিরবে না, সে নিশ্চয় জানি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা, দেনা-পাওনার কথা, খাওয়ান-দাওয়ানর কথা সমস্তই প্রায় স্থির করিয়া পরদিন অপরাহ্ণে বৃন্দাবনের জননী বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

তখন চন্ডীমন্ডপের সুমুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া পোড়োরা নামতা আবৃত্তি করিতেছিল, বৃন্দাবন একধারে দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছিল। গরুর গাড়ি সুমুখে আসিয়া থামিতেই তাহার শিশুপুত্র চরণ গাড়ি হইতে নামিয়া চেঁচামেচি করিয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল, মাতুলানী পছন্দ করিতে সেও আজ পিতামহীর সঙ্গে গিয়াছিল। বৃন্দাবন তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গাড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মা তখন নামিতেছিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, কবে দিন স্থির করে এলে মা?

এই মাসের শেষে আর দিন নেই, তুই ভিতরে আয়—অনেক কথা আছে; বলিয়া তিনি হাসিমুখে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাঁর নিজের ঘরে বৌ আসিবে, এই আনন্দে তাঁর বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তা ছাড়া, ঐ একটি দিনে ঘরকন্নার গৃহিণীপনায় কুসুমকে তিনি সত্যই ভালবাসিয়াছিলেন। নিজে সুখী হইবেন, একমাত্র সন্তানকে যথার্থ সুখী করিবেন, তাহাদের হাতে ঘর-সংসার সঁপিয়া দিয়া তীর্থ-ধর্ম করিয়া বেড়াইবেন—এইসব সুখস্বপ্নের কাছে আর সমস্ত কাজই তাঁর সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছিল। তাই গোকুলের বিধবার সমস্ত প্রস্তাবেই তিনি সম্মত হইয়া, সমস্ত ব্যয়ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

ও-বেলায় তাঁহার খাওয়া হয় নাই। সহজে তিনি কোথাও কিছু খাইতে চাহিতেন না, বৃন্দাবন তাহা জানিত। সে পাঠশালের ছুটি দিয়া ভিতরে আসিয়া

দেখিল, সেদিকের কোন উদ্যোগ না করিয়াই তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বৃন্দাবন বলিল, উপোস করে ভাবলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। পরের ভাবনা পরে ভেব মা, আগে সেই চেষ্টা কর।

মা বলিলেন, সে সন্ধ্যার পরে হবে। না রে তামাশা নয়, আর সময় নেই—সে পাগলের না আছে টাকাকড়ি, না আছে লোকজন, আমাকেই সব ভার বইতে হবে—মেয়ের মা দেখলুম বেশ শক্ত মানুষ—সহজে কিছুতেই রাজি হতে চায় না। তবে আমিও ছাড়বার লোক নই—ওরে ঐ যে! সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক বাবা, তোমারই কথা হচ্ছিল, এস বস। হঠাৎ এ-সময়ে যে?

বাস্তবিক গ্রামান্তর হইতে পরের বাড়ি আসার এটা সময় নয়।

কুঞ্জনাথ বাড়ি ঢুকিয়াই এ-রকমের সংবর্ধনা পাইয়া প্রথমটা থতমত খাইল। তারপর অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিল।

বৃন্দাবন পরিহাস করিয়া কহিল, আচ্ছা কুঞ্জদা, টের পেলে কি করে? রাতটাও কি চুপ করে থাকতে পারলে না, না হয় কাল সকালে এসেই শুনতে?

মা একটু হাসিলেন। কুঞ্জ কিন্তু এদিক দিয়াও গেল না। সে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! বোন নয় ত, যেন দারোগা!

বৃন্দাবন ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল; মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৌমা কিছু বলে পাঠিয়েচেন বুঝি?

কুঞ্জ সে-প্রশ্নেরও জবাব না দিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা মা, তোমার এ কি-রকম ভুল? ধর, কুসুমের চোখে না পড়ে যদি আর কারও চোখে পড়ত, তা হলে কি সর্বনাশ হত বল ত!

কথাটা তিনি বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্নমুখে চাহিয়া রহিলেন।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি কুঞ্জদা?

ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া কুঞ্জ নিজেকে হালকা করিতে চাহিল না; তাই বৃন্দাবনের প্রশ্ন কানেও তুলিল না। মাকে বলিল, আগে কি খাওয়াবে, তবে বলব।

মা এবার হাসিলেন; বলিলেন, তা বেশ ত বাবা, এ তোমারই বাড়ি, কি খাবে বল?

কুঞ্জ কহিল, আচ্ছা, সে আর একদিন হবে—তোমার কি হারিয়েচে আগে বল?

বৃন্দাবনের মা চিন্তিত হইলেন। একটু থামিয়া সন্দিগ্ধসুরে বলিলেন, কৈ কিছুই ত হারায় নি!

কথা শুনিয়া কুঞ্জ হোহো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; পরে নিজের চাদরের মধ্যে হাত দিয়া একজোড়া সোনার বালা মেলিয়া ধরিয়া বলিল, তা হলে এটা তোমাদের নয় বল? বলিয়া মহা-আহ্লাদে নিজের মনেই হাসিতে লাগিল।

এ সেই বালা, যাহা কাল এমনই সময়ে পরমস্নেহে স্বহস্তে পুত্রবধুর হাতে পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। আজ সেই অলঙ্কার, সেই আশীর্বাদ সে নির্বোধ কুঞ্জর হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবন একমুহূর্ত সেদিকে চাহিয়া, মায়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া ভীত হইয়া উঠিল। মুখে একফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। অপরাহ্নের ম্লান আলোকে তাহা শবের মুখের মত পান্ডুর দেখাইল। বৃন্দাবনের নিজের বুকের মধ্যে যে কি করিয়া উঠিয়াছিল, সে শুধু অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু নিজেকে সে প্রবল চেষ্টায় চক্ষের নিমেষে সামলাইয়া লইয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া সহজ ও শান্তভাবে বলিল, মা আমার বড় ভাগ্য যে, ভগবান আমাদের জিনিস আমাদেরই ফিরিয়ে দিলেন। এ তোমার হাতের বালা, সাধ্য কি মা যে-সে পরে? কুঞ্জদা, চল আমরা বাইরে গিয়ে বসি গে। বলিয়া কুঞ্জর একটা হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ সোজা মানুষ, তাই মহা আহ্লাদে অসময়ে এতটা পথ ছুটিয়া আসিয়াছিল। আজ দুপুরবেলা তাহার খাওয়া-দাওয়ার পরে যখন কুসুম ম্লানমুখে বালাজোড়াটি হাতে করিয়া আনিয়া শুষ্ক মৃদুকণ্ঠে বলিয়াছিল, দাদা, কাল তাঁরা ভুলে ফেলে রেখে গেছেন, তোমাকে একবার গিয়ে দিয়ে আসতে হবে; তখন আনন্দের আতিশয্যে সে তাহার মলিন মুখ লক্ষ্য করিবার অবকাশও পায় নাই।

ঘুরপ্যাঁচ সে বুঝিতে পারে না, তাহার বোনের কথা সত্য নয়,—মানুষ মানুষকে এত দামী জিনিস দিতে পারে, কিংবা দিলে আর একজন তাহা গ্রহণ করে না—ফিরাইয়া দেয়, এ-সব অসম্ভব কান্ড তাহার বুদ্ধির অগোচর। তাই সারাটা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এই হারানো জিনিস অকস্মাৎ ফিরিয়া পাইয়া তাঁহারা কিরূপ সুখী হইবেন, তাহাকে কত আশীর্বাদ করিবেন—এইসব।

কিন্তু কৈ, সে-রকম ত কিছুই হইল না? যাহা হইল, তাহা ভাল কি মন্দ, সে ঠিক ধরিতে পারিল না; কিন্তু এতবড় একটা কাজ করিয়াও মায়ের মুখের একটা ভাল কথা, একটা আশীর্বচন না পাইয়া তাহার মন ভারী খারাপ হইয়া গেল। বরং বৃন্দাবন তাহাকে যেন তাঁহার সুমুখ হইতে বাহিরে তাড়াইয়া আনিয়াছে, এমনই একটা লজ্জাকর অনুভূতি তাহাকে ক্রমশঃ চাপিয়া ধরিতে লাগিল। সে লজ্জিত বিষণ্ণমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পাশে বসিয়া বৃন্দাবনও কথা কহিল না। বাক্যালাপ করিবার অবস্থা তাহার নহে—তাহার বুকের ভিতরটা তখন অপমানের আগুনে পুড়িয়া যাইতেছিল। অপমান তাহার নিজের নয়—মায়ের।

নিজের ভাল-মন্দ, মান-অপমান আর ছিল না। মৃত্যু-যাতনা যেমন আর সর্বপ্রকার যাতনা আকর্ষণ করিয়া একা বিরাজ করে, জননীর অপমানাহত বিবর্ণ মুখের স্মৃতি ঠিক তেমনিই করিয়া তাহার সমস্ত অনুভূতি গ্রাস করিয়া, একটিমাত্র নিবিড় ভীষণ অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হইয়া আসিল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে কহিল, বৃন্দাবন, আজ তবে যাই ভাই।

বৃন্দাবন বিহ্বলের মত চাহিয়া বলিল, যাও, কিন্তু আর একদিন এস।

কুঞ্জ চলিয়া গেল, বৃন্দাবন সেইখানে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, জননীর কি আশা, কি ভবিষ্যতের কল্পনাই এক নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল! এখন, কি উপায়ে তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে—কাছে গিয়া কোন্ সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করিবে।

আবার সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যে এমন করিয়া সমস্ত নির্মূল করিয়া দিয়া তাহার উপবাসী, শান্ত সন্ন্যাসিনী মাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারিল—সে তাহার স্ত্রী, তাহাকেই সে ভালবাসে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাল একটি দিনের মেলামেশায় কুসুম তাহার শাশুড়ি ও স্বামীকে যেমন চিনিয়াছিল, তাঁহারাও যে ঠিক তেমনি চিনিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

যাঁহারা চিনিতে জানেন, তাঁহাদের কাছে এমন করিয়া নিজেকে সারাদিন ধরা দিতে পাইয়া শুধু অভূতপূর্ব আনন্দে হৃদয় তাহার স্ফীত হইয়া উঠে নাই, নিজের আগোচরে একটা দুশ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধনে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। সেই বাঁধন আজ আপনার হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বালাজোড়াটি যখন ফিরাইয়া দিতে দিল, এবং নিরীহ কুঞ্জনাথ মহা উল্লাসে বাহির হইয়া গেল, তখন মুহুর্তের জন্য সেই ক্ষত-বেদনা তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাঁদিতে লাগিল। যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, তাহার এই নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহাদের নিকট কত অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও কিরূপ ভয়ানক মর্মান্তিক হইযা বাজিবে এবং তাহার সম্বন্ধে মনের ভাব তাঁহাদের' কি হইয়া যাইবে!

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুঞ্জ বাড়ি ফিরিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া ভগিনীর ঘরের সুমুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কুসি, আলো জ্বালাস নি রে?

কুসুম তখনও মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই দিই দাদা। কখন এলে?

এই ত আসচি, বলিয়া কুঞ্জ সন্ধান করিয়া হুঁকা-কলিকা সংগ্রহ করিয়া তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখনো প্রদীপ সাজানো হয় নাই, অতএব, সেইসব প্রস্তুত করিয়া আলো জ্বালিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তামাক সাজিয়া লইয়া দাদা চলিয়া গিয়াছে।

প্রতিদিনের মত আজ রাত্রেও ভাত বাড়িয়া দিয়া কুসুম অদূরে বসিয়া রহিল। কুঞ্জ গম্ভীর মুখে ভাত খাইতে লাগিল, একটি কথাও কহিল না। যে লোক কথা কহিতে পাইলে আর কিছু চাহে না, তাহার সহসা আজ এতবড় মৌনাবলম্বনে কুসুম আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

একটা কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা কি, এবং কতদূর গিয়াছে ইহাই জানিবার জন্য সে ছটফট করিতে লাগিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, দাদাকে তাঁহারা অতিশয় অপমান করিয়াছেন। কারণ ছোটখাটো অপমান তাহার দাদা ধরিতে পারে না এবং পারিলেও এতক্ষণ মনে রাখিতে পারে না, ইহা সে নিশ্চিত জানিত।

আহার শেষ করিয়া কুঞ্জ উঠিতেছিল, কুসুম আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে কার হাতে দিয়ে এলে দাদা?

কুঞ্জ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, আবার কার হাতে, মার হাতে দিয়ে এলুম।

কি বললেন তিনি?

কিছু না, বলিয়া কুঞ্জ বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন ফেরি করিতে বাহির হইবার সময় সে নিজেই ডাকিয়া বলিল, তোর শাশুড়িঠাকরুন কি এক-রকম যেন হয়ে গেছে কুসুম। অমন জিনিস হাতে দিয়ে এলুম, তা একটি কথা বললে না। বরং বৃন্দাবনকে ভাল বলতে হয়, সে খুশি হয়ে বলতে লাগল, সাধ্য কি মা, যে-সে লোক তোমার বালা হাতে রাখতে পারে! আমার বড় ভাগ্য মা, তাই ভগবান আমাদের জিনিস আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলেন–ও কি রে?

কুসুমের গৌরবর্ণ মুখ একেবারে পান্ডুর হইয়া গিয়াছিল। সে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না। এ-কথা তিনি বললেন?

হাঁ, সে-ই বললে। মা একটা কথাও কইলেন না। তা ছাড়া তিনি কোথায় নাকি সারাদিন গিয়েছিলেন, তখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি–এমন করে আমার পানে চেয়ে রইলেন যে, কি দিলুম, কি বললুম, তা যেন বুঝতেই পারলেন না। বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া ধামা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তিন-চারিদিন গত হইয়াছে, রান্না ভাল হয় নাই বলিয়া কুঞ্জ পরশু ও কাল মুখ ভার করিয়াছিল, আজ স্পষ্ট অভিযোগ করিতে গিয়া এইমাত্র ভাইবোনে তুমুল কলহ হইয়া গেল।

কুঞ্জ ভাত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এ পুড়ে যায়, ও পুড়ে যায়, আজকাল মন তোর কোথায় থাকে কুসী?

কুসীও ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল, আমি কারো কেনা দাসী নই— পারব না রাঁধতে— যে ভাল রেঁধে দেবে তাকে আনো গে।

কুঞ্জর পেট জ্বলিতেছিল, আজ সে ভয় পাইল না। হাত নাড়িয়া বলিল, তুই আগে দুর হ, তখন আনি কি না দেখিস। বলিয়া ধামা লইয়া নিজেই তাড়াতাড়ি দূর হইয়া গেল।

সেইদিন হইতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য কুসুম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এতবড় সুযোগ সে ত্যাগ করিল না।

দাদার অভুক্ত ভাতের থালা পড়িয়া রহিল, সদর দরজা তেমনি খোলা রহিল, সে আঁচল পাতিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠে মাথা দিয়া একেবারে মড়াকান্না শুরু করিয়া দিল।

বেলা বোধ করি তখন দশটা, ঘন্টাখানেক কাঁদিয়া-কাটিয়া শ্রান্ত হইয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, বৃন্দাবন উঠানে

দাঁড়াইয়া 'কুঞ্জদা' 'কুঞ্জদা' করিয়া ডাকিতেছে। তাহার হাত ধরিয়া বছর-ছয়েকের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর শিশু। কুসুম শশব্যস্তে মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া কবাটের আড়ালে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সব ভুলিয়া শিশুর সুন্দর মুখের পানে কবাটের ছিদ্রপথে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এ যে তাহারই স্বামীর সন্তান, তাহা সে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল এবং দুই বাহু যেন সহস্র বাহু হইয়া উহাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য তাহার বক্ষঃপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল, তথাপি সে সাড়া দিতে, পা বাড়াইতে পারিল না, পাথরের মূর্তির মত একভাবে পলকবিহীন চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারো সাড়া না পাইয়া বৃন্দাবন কিছু বিস্মিত হইল।

আজ সকালে নিজের কাজে সে এইদিকে আসিয়াছিল এবং কাজ সারিয়া ফিরিবার পথে ইহাদের দোর খোলা দেখিয়া কুঞ্জ ঘরে আছে মনে করিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল। কুঞ্জর কাছে তাহার বিশেষ আবশ্যক ছিল। গোযান সজ্জিত দেখিয়া তাহার পুত্র 'চরণ' পূর্বাহ্নেই চড়িয়া বসিয়াছিল, তাই সে-ও সঙ্গে ছিল।

বৃন্দাবন আবার ডাক দিল, কেউ বাড়ি নেই নাকি?

তথাপি সাড়া নাই।

চরণ কহিল, জল খাবো বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েচে।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া ধমক দিল, না, পায়নি, যাবার সময় নদীতে খাস।

সে বেচারা শুষ্কমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন কুসুম লজ্জার প্রথম বেগটা কাটাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে বৃন্দাবনের সুমুখে বাহির হইয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা অতি সহজেই কহিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার সর্বাঙ্গ লজ্জায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।

চরণ পিপাসার কথা না জানাইলে সে বোধ করি কোনমতেই সুমুখে আসিতে পারিত না। সে একবার একমুহূর্ত দ্বিধা করিল, তারপর একখানি ক্ষুদ্র আসন হাতে করিয়া আনিয়া দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া, কাছে আসিয়া চরণকে কোলে করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন এ ইঙ্গিত বুঝিল, কিন্তু চরণ যে কি ভাবিয়া কথাটি না কহিয়া এই সম্পূর্ণ অপরিচিতার ক্রোড়ে উঠিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না। পুত্রের স্বভাব পিতা ভাল করিয়া জানিত।

এদিকে চরণ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। একে ত এইমাত্র সে ধমক খাইয়াছে, তাহাতে অচেনা জায়গায় হঠাৎ কোথা হইতে বাহির হইয়া এমন ছোঁ মারিয়া কোনদিন কেহ তাহাকে লইয়া যায় নাই।

কুসুম ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে বাতাসা দিল, তারপর কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সহসা প্রবলবেগে বুকের উপর টানিয়া লইয়া দুই বাহুতে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চরণ নিজেকে এই সুকঠিন বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে সে চোখ মুছিয়া বলিল, ছি বাবা, আমি যে মা হই।

ছেলের উপর বরাবরই তাহার ভয়ানক লোভ ছিল, কাহাকেও কোনমতে একবার হাতের মধ্যে পাইলে আর ছাড়িতে চাহিত না, কিন্তু আজিকার মত এমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ঝড় বুঝি আর কখনও তাহার মধ্যে উঠে নাই।

বুক যেন তাহার ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। এই মনোহর সুস্থ সবল শিশু তাহারই হইতে পারিত, কিন্তু কেন হইল না? কে এমন বাদ সাধিল? সন্তান হইতে জননীকে বঞ্চিত করিবার এতবড় অনধিকার সংসারে কার আছে? চরণকে সে যতই নিজের বুকের উপর অনুভব করিতে লাগিল ততই তাহার বঞ্চিত, তৃষিত মাতৃহৃদয় কিছুতেই যেন সান্ত্বনা মানিতে চাহিল না। তাহার কেবলই মনে

হইতে লাগিল, তার নিজের ধন জোর করিয়া, অন্যায় করিয়া অপরে কাড়িয়া লইয়াছে।

কিন্তু চরণের পক্ষে অসহ্য হইহা উঠিয়াছিল। এমন জানিলে সে বোধ করি নদীতেই জল খাইত। এই স্নেহের পীড়ন হইতে পিপাসা বোধ করি অনেক সুসহ হইতে পারিত। কহিল, ছেড়ে দাও।

কুসুম দুই হাতের মধ্যে তাহার মুখখানি লইয়া বলিল, মা বল, তাহলে ছেড়ে দেব।

চরন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহলে ছেড়ে দেব না, বলিয়া কুসুম বুকের মধ্যে আবার চাপিয়া ধরিল। টিপিয়া, পিষিয়া, চুমা খাইয়া তাহাকে হাঁপাইয়া তুলিয়া বলিল, মা না বললে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না।

চরণ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা।

ইহার পরে ছাড়িয়া দেওয়া কুসুমের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর একবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছিল। বাহির হইতে বৃন্দাবন কহিল, তোর জল খাওয়া হল রে চরণ?

চরণ কাঁদিয়া বলিল ছেড়ে দেয় না যে।

কুসুম চোখ মুছিয়া ভাঙ্গা গলায় কহিল, আজ চরণ আমার কাছে থাক!

বৃন্দাবন দ্বারের সন্নিকটে আসিয়া বলিল, ও থাকতে পারবে কেন? তা ছাড়া, এখনও খায়নি, মা বড় ব্যস্ত হবেন।

কুসুম তেমনিভাবে জবাব দিল, না, ও থাকবে। আজ আমার বড় মন খারাপ হয়ে আছে।

মন খারাপ কেন?

কুসুম সে-কথার উত্তর দিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, গাড়ি ফিরিয়ে দাও, বেলা হয়েছে, আমি নদী থেকে চরণকে স্নান করিয়ে আনি। বলিয়া আর কোনরূপ প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া গামছা ও তেলের বাটি হাতে লইয়া চরণকে কোলে করিয়া নদীতে চলিয়া গেল।

বাটীর নীচেই স্বচ্ছ ও স্বল্পতোয়া নদী, জল দেখিয়া চরণ খুশি হইয়া উঠিল। তাহাদের গ্রামে নদী নাই, পুষ্করিণী আছে, কিন্তু তাহাতে নামিতে দেওয়া হয় না, সুতরাং এ সৌভাগ্য তাহার ইতিপূর্বে ঘটে নাই। ঘাটে গিয়া সে স্থির হইয়া তেল মাখিল, এবং উপর হইতে হাঁটুজলে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর কিছুক্ষণ মাতামাতি করিয়া স্নান সারিয়া কোলে চড়িয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন মাতাপুত্রে বিলক্ষণ সদ্ভাব হইয়া গিয়াছে।

ছেলে কোলে করিয়া কুসুম সুমুখে আসিল। মুখ তাহার সম্পূর্ণ অনাবৃত। মাথার আঁচল ললাট স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র। যাইবার সময় সে মন খারাপের কথা বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু দুঃখ-কষ্টের আভাসমাত্রও সে-মুখে দেখিতে পাইল না। বরং সদ্যঃবিকশিত গোলাপের মত ওষ্ঠাধর চাপাহাসিতে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাহার আচরণে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা একেবারে নাই; সহজভাবে কহিল, এবার তুমি যাও, স্নান করে এস।

তারপরে?

খাবে।

তারপরে?

খেয়ে একটু ঘুমোবে।

তারপরে?

যাও, আমি জানিনে। এই গামছা নাও—আর দেরি কর না, বলিয়া সে সহাস্যে গামছাটা স্বামীর গায়ের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বৃন্দাবন গামছা ধরিয়া ফেলিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া একটা অতি দীর্ঘশ্বাস অলক্ষ্যে মোচন করিয়া শেষে কহিল, বরং তুমি বিলম্ব করো না। চরণকে যা হোক দুটো খাইয়ে দাও—আমাদের বাড়ি যেতেই হবে।

যেতেই হবে কেন? গাড়ি ফিরে গেলেই মা বুঝতে পারবেন।

ঠিক সেইজন্যেই গাড়ি ফিরে যায়নি, একটু আগে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

সংবাদ শুনিয়া কুসুমের হাসিমুখ মলিন হইয়া গেল। শুষ্কমুখে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, তাহলে আমি বলি, মায়ের অমতে এখানে তোমার আসাই উচিত হয়নি।

তাহার গূঢ় অভিমানের সুর লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিল না। তার পরে সহজভাবে বলিল, আমি এমন হয়ে মানুষ হয়েচি কুসুম, যে, মায়ের অমতে এ বাড়িতে কেন, এ গ্রামেও পা দিতে পারতুম না।

যাক, যে কথা শেষ হয়ে গেছে, সে কথা তুলে কোন পক্ষেরই আর লাভ নেই—তোমারও না, আমারও না। যাও আর দেরি করো না, ওকে খাইয়ে দাও গে। বলিয়া বৃন্দাবন ফিরিয়া গিয়া আসনে বসিল।

কুসুম চোখের জল চাপিয়া মৌন-অধোমুখে ছেলে লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

ঘন্টা-খানেক পরে পিতাপুত্রে গাড়ি চড়িয়া যখন গৃহে ফিরিয়া চলিল, তখন পথে চরণ জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, মা অত কাঁদছিল কেন?

বৃন্দাবন আশ্চর্য হইয়া বলিল, তোর মা হয় কে বলে দিলে রে?

চরণ জোর দিয়া কহিল, হাঁ, আমার মা-ই ত হয়—হয় না?

বৃন্দাবন ও-কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই থাকতে পারিস তোর মার কাছে?

চরণ খুশি হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, পারি বাবা।

আচ্ছা, বলিয়া বৃন্দাবন মুখ ফিরাইয়া গাড়ির একধারে শুইয়া পড়িল, এবং রৌদ্রতপ্ত স্বচ্ছ আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন অপরাহ্ণবেলায় কুসুম নদীতে জল আনিবার জন্য সদর দরজায় শিকল তুলিয়া দিতেছিল, একটি বার-তের বছরের বালক এদিকে-ওদিকে চাহিয়া কাছে আসিয়া বলিল, তুমি কুঞ্জ বৈরাগীর বাড়ি দেখিয়ে দিতে পার?

পারি, তুমি কোথা থেকে আসচ?

বাড়ল থেকে। পণ্ডিতমশাই চিঠি দিয়েছেন, বলিয়া সে মলিন উত্তরীয়ের মধ্যে হাত দিয়া একখানি চিঠি বাহির করিয়া দেখাইল।

কুসুমের শিরার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল উপরে তাহারই নাম। খুলিয়া দেখিল, অনেক লেখা-বৃন্দাবনের স্বাক্ষর।

কি কথা লেখা আছে তাহাই জানিবার উম্মত্ত-আগ্রহ সে প্রাণপণে দমন করিয়া ছেলেটিকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি পণ্ডিতমশাই কাকে বলছিলে? কে তোমার হাতে চিঠি দিলে?

ছেলেটি আশ্চর্য হইয়া বলিল, পণ্ডিতমশাই দিলেন।

কুসুম পাঠশালার কথা জানিত না, বুঝিতে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করিল, তুমি চরণের বাপকে চেন?

চিনি—তিনিই ত পণ্ডিতমশাই।

তাঁর কাছে তুমি পড়?

আমি পড়ি, পাঠশালে আরো অনেক পোড়ো আছে।

কুসুম উৎসুক হইয়া উঠিল এবং তাহাকে প্রশ্ন করিয়া এ-সম্বন্ধে সমস্ত জানিয়া লইল। পাঠশালা বাটীতে প্রতিষ্ঠিত, বেতন লাগে না, পণ্ডিতমশাই নিজেই শ্লেট পেনসিল প্রভৃতি কিনিয়া দেন, যে-সকল দরিদ্র ছাত্র দিনের বেলায় অবকাশ পায় না, তাহারা সন্ধ্যার সময় পড়িতে আসে এবং ঠাকুরের আরতি শেষ হইয়া গেলে প্রসাদ খাইয়া কলরব করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। দুইজন বয়স্ক ছাত্র

পাঠশালে ইংরাজী পড়ে, ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জানিয়া লইয়া কুসুম ছেলেটিকে মুড়ি, বাতাসা প্রভৃতি দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া চিঠি খুলিয়া বসিল।

সুখের স্বপ্ন কে যেন প্রবল ঝাঁকানি দিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। পত্র তাহাকেই লেখা বটে, কিন্তু একটা সম্ভাষণ নাই, একটা স্নেহের কথা নাই, একটু আশীর্বাদ পর্যন্ত নাই। অথচ, এই তার প্রথম পত্র। ইতিপূর্বে আর কেহ তাহাকে পত্র লেখে নাই সত্য, কিন্তু সে তার সঙ্গিনীদের অনেকেরই প্রেমপত্র দেখিয়াছে—তাহাতে ইহাতে কি কঠোর প্রভেদ!আগাগোড়া কাজের কথা। কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা। এ কথা বলিতেই সে কাল আসিয়াছিল। বৃন্দাবন জানাইয়াছে, মা সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, এবং সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহিবেন। সব দিক দিয়াই এ বিবাহ প্রার্থনীয়, কেননা, ইহাতে কুঞ্জনাথের এবং সেই সঙ্গে তাহারও সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট ঘুচিবে। এই ইঙ্গিতটা প্রায় স্পষ্ট করিয়াই দেওয়া হইয়াছে।

একবার শেষ করিয়া সে আর-একবার পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবার সমস্ত অক্ষরগুলা তাহার চোখের সুমুখে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে চিঠিখানা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া কোনমতে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহাদের এত বড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনাও তাহার মনের মধ্যে একবিন্দু পরিমাণও আনন্দের আভাস জানাইতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাস-খানেক হইল, কুঞ্জনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন সেদিন হইতে আর আসে নাই। বিবাহের দিনেও জ্বর হইয়াছে বলিয়া অনুপস্থিত ছিল। মা চরণকে লইয়া শুধু সেই দিনটির জন্য আসিয়াছিলেন, কারণ গৃহদেবতা ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও তাঁহার থাকিবার জো ছিল না। শুধু চরণ আরও পাঁচ-ছয়দিন ছিল। মনের মতন নূতন মা পাইয়াই হোক বা নদীতে স্নান করিবার লোভেই হোক, সে ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই, পরে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই অবধি কুসুমের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বিবাহ না হইতেই সে যে-সমস্ত আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই এখন অক্ষরে অক্ষরে ফলিবার উপক্রম করিতেছিল। দাদাকে সে ভালমতেই চিনিত, ঠিক বুঝিয়াছিল, দাদা শাশুড়ির পরামর্শে এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া ঘরজামাই হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল। যে মাথায় টোপর পরিয়া কুঞ্জ বিবাহ করিতে গিয়াছিল, সেই মাথায় আর ধামা বহিতে চাহিল না। নলডাঙ্গার লোক শুনিলে কি বলিবে? বিবাহের সময় বৃন্দাবনের জননী কৌশল করিয়া কিছু নগদ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাল খরিদ করিয়া বাহিরে পথের ধারে একটা চালা বাঁধিয়া, সে মনিহারীর দোকান খুলিয়া বসিল। এক পয়সাও বিক্রি হইল না। অথচ এই একমাসের মধ্যেই সে নূতন জামা-কাপড় পরিয়া, জুতা পায়ে দিয়া, তিন-চারিবার শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত করিল। পূর্বে কুঞ্জ কুসুমকে ভারী ভয় করিত, এখন আর করে না। চাল-ডাল নাই জানাইলে সে চুপ করিয়া দোকানে গিয়া বসে, না হয় কোথায় সরিয়া যায়–সমস্ত দিন আসে না। চারিদিকে চাহিয়া কুসুম প্রমাদ গণিল। তাহার যে কয়েকটি জমানো টাকা ছিল, তাহাই খরচ হইয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, তথাপি কুঞ্জ চোখ মেলিল

না। নূতন দোকানে বসিয়া সারাদিন তামাক খায় এবং ঝিমায়। লোক জুটিলে শ্বশুরবাড়ির গল্প এবং নূতন বিষয়-আশয়ের ফর্দ তৈয়ার করে।

সেদিন সকালে উঠিয়া কুঞ্জ নূতন বার্নিশ-করা জুতায় তেল মাখাইয়া চকচকে করিতেছিল, কুসুম রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া কহিল, আবার আজও নলডাঙ্গায় যাবে বুঝি?

হুঁ, বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে কাজ করিতে লাগিল।

খানিক পরে কুসুম মৃদুস্বরে কহিল, সেখানে এই ত সেদিন গিয়েছিলে দাদা। আজ একবার আমার চরণকে দেখে এসো। অনেকদিন ছেলেটার খবর পাইনি, বড় মন খারাপ হয়ে আছে।

কুঞ্জ উত্যক্ত হইয়া কহিল, তোর সব তাতেই মন খারাপ হয়। সে ভাল আছে।

কুসুমের রাগ হইল। কিন্তু সংবরণ করিয়া বলিল, ভালই থাক। তবু একবার দেখে এসো গে, শ্বশুরবাড়ি কাল যেয়ো।

কুঞ্জ গরম হইয়া উঠিল-কাল গেলে কি করে হবে? সেখানে একটি পুরুষ মানুষ পর্যন্ত নেই। ঘরবাড়ি বিষয়-আশয় কি হচ্চে, না হচ্চে—সব ভার আমার মাথায়—আমি একা মানুষ কতদিক সামলাব বল্ ত?

দাদার কথার ভঙ্গীতে এবার কুসুম রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, পারবে সামলাতে দাদা। তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবারটি যাও-কি জানি কেন সত্যিই তার জন্যে বড় মন কেমন কচ্ছে।

কুঞ্জ জুতা-জোড়াটা হাত দিয়া ঠেলিয়া অতি রুক্ষস্বরে কহিল, আমি পারব না যেতে। বৃন্দাবন আমার বিয়ের সময় আসেনি কেন, এতই কি সে আমার চেয়ে বড়লোক যে একবার আসতে পারলে না, শুনি?

কুসুমের উওরোওর অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি সে শান্তভাবে বলিল, তাঁর জ্বর হয়েছিল।

হয়নি। নলডাঙ্গায় বসে মা খবর শুনে বললেন, মিছে কথা, চালাকি। তাঁকে ঠকানো সোজা কাজ নয় কুসুম, তিনি ঘরে বসে রাজ্যের খবর দিতে পারেন, তা জানিস? নেমকহারাম আর কাকে বলে, একেই বলে। আমি তার মুখ দেখতেও চাইনে। বলিয়া কুঞ্জ গম্ভীরভাবে রায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিল।

কুসুম বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, নেমকহারাম তিনি! নুন তাঁকে সেইদিন বেশি করে খাইয়েছিলে, যেদিন ডেকে এনে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। দাদা, তুমি এমন হয়ে যেতে পার, এ বোধ করি, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

কুঞ্জর তরফে এ অভিযোগের জবাব ছিল না। তাই সে যেন শুনিতেই পাইল না, এইরকম ভাব করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম পুনরায় কহিল, যা তুমি তোমার বিষয়-আশয় বলচ, সে কার হত? কে তোমার বিয়ে দিয়ে দিলে?

কুঞ্জ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কে কার বিয়ে দিয়ে দেয়? মা বলেন, ফুল ফুটলে কেউ আটকাতে পারে না। বিয়ে আপনি হয়।

আপনি হয়?

হয়ই ত।

কুসুম আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ছি ছি, এ-সব কথা যদি তাঁহারা শুনিতে পান! শুনিলে, প্রথমেই তাঁহাদের মনে হইবে, এই দুটি ভাই-বোন এক ছাঁচে ঢালা!

মিনিট-কুড়ি পরে নূতন জুতার মচমচ শব্দ শুনিয়া কুসুম বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে ফিরবে?

কাল সকালে।

আমাকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে যেতে তোমার ভয় করে না? লজ্জা হয় না?

কেন, এখানে কি বাঘ-ভাল্লুক আছে যে তোকে খেয়ে ফেলবে? আমি সকালেই ত ফিরে আসব, বলিয়া কুঞ্জ শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল।

কুসুম ফিরিয়া গিয়া জ্বলন্ত উনানে জল ঢালিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুতপ্ত দুষ্কৃতকারী নিরুপায় হইলে যেমন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করে, ঠিক তেমনি মুখের চেহারা করিয়া বৃন্দাবন জননীর কাছে আসিয়া বলিল, আমাকে মাপ কর মা, হুকুম দাও আমি খুঁজে পেতে তোমাকে একটি দাসী এনে দিই। চিরকাল এই সংসার ঘাড়ে নিয়ে তোমাকে সারা হয়ে যেতে আমি কিছুতেই দেব না।

মা ঠাকুর-ঘরে পূজার সাজ প্রস্তুত করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি করবি?

তোমার দাসী আনব। যে চরণকে দেখবে, তোমার সেবা করবে, আবশ্যক হলে এই ঠাকুর ঘরের কাজ করতেও পারবে। হুকুম দেবে ত মা? প্রশ্ন করিয়া বৃন্দাবন উৎসুক ব্যথিত-দৃষ্টিতে জননীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মা এবার বুঝিলেন। কারণ, স্বজাতি ভিন্ন এ ঘরে প্রবেশাধিকার সাধারণ দাসীর ছিল না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি তুই সত্যি বলছিস বৃন্দাবন?

সত্যি বৈ কি মা! ছেলেবেলা মিথ্যে বলে থাকি ত সে তুমি জান ; কিন্তু বড় হয়ে তোমার সামনে কখন ত মিথ্যে বলিনি মা!

আচ্ছা, ভেবে দেখি, বলিয়া মা একটু কাজে মন দিলেন।

বৃন্দাবন সুমুখে আসিয়া বলিল, সে হবে না মা। তোমাকে আমি ভাবতে সময় দেব না। যা হোক একটা হুকুম নিয়ে এ ঘর থেকে বার হব বলে এসেছি, হুকুম নিয়েই যাব।

কেন ভাবতে সময় দিবিনে?

তার কারণ আছে মা! তুমি ভেবে-চিন্তে যা বলবে, সে শুধু তোমার নিজের কথাই হবে, আমার মায়ের হুকুম হবে না। আমি ভালমন্দ পরামর্শ চাইনে—শুধু অনুমতি চাই।

মা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু একদিন যখন অনুমতি দিয়েছিলুম, সাধাসাধি করেছিলুম, তখন ত শুনিস নি বৃন্দাবন?

তা জানি। সেই পাপের ফলই এখন চারদিক থেকে ঘিরে ধরেচে, বলিয়া বৃন্দাবন মুখ নত করিল।

সে যে এখন শুধু তাঁহাকেই সুখী করিবার জন্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে এবং ইহা কাজে পরিণত করিতে তাহার যে কিরূপ বাজিবে, ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া মার চোখে জল আসিল। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, এখন থাক্ বৃন্দাবন, দু'দিন পরে বলব।

বৃন্দাবন জিদ করিয়া কহিল, যে কারণে ইতস্তত: করচ মা, তা দু'দিন পরেও হবে না। যে তোমাকে অপমান করেচে, ইচ্ছে হয়, তাকে তুমি ক্ষমা করো, কিন্তু আমি করবো না। আর পারিনে মা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি একটু সুস্থ হয়ে বাঁচি।

মা মুখ তুলিয়া আবার চাহিলেন। ক্ষণকাল ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, অনুমতি দিলুম।

এ নিশ্বাসের মর্ম বৃন্দাবন বুঝিল, কিন্তু সেও আর কথা কহিল না। নি:শব্দে পায়ে মাথা ঠেকাইয়া, পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিতমশায়, আপনার চিঠি, বলিয়া পাঠশালের এক ছাত্র আসিয়া একখানা পত্র হাতে দিল।

মা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠি বৃন্দাবন?

জানিনে মা, দেখি, বলিয়া বৃন্দাবন অন্যমনস্কের মত নিজের ঘরে চলিয়া গেল। খুলিয়া দেখিল, মেয়েলি অক্ষরে পরিষ্কার স্পষ্ট লেখা। কাটাকুটি নাই,

বর্ণাশুদ্ধি নাই, উপরে শ্রীচরণকমলেষু পাঠ লেখা আছে, কিন্তু নীচে দস্তখত নাই। কুসুমের হস্তাক্ষর সে পূর্বে না দেখিলেও তৎক্ষণাৎ বুঝিল, ইহা তাহারই পত্র।

সে লিখিয়াছে–দাদাকে দেখিলে এখন তুমি আর চিনিতে পারিবে না। কেন, তাহা অপরকে কিছুতেই বলা যায় না, এমন কি, তোমাকে বলিতেও আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হইতেছে। তিনি আবার আজিও শ্বশুরবাড়ি গেলেন। হয়ত কাল ফিরিবেন। নাও ফিরিতে পারেন, কারণ বলিয়া গিয়াছেন, এখানে বাঘ-ভাল্লুক নাই, একা পাইয়া আমাকে কেহ খাইয়া ফেলিবে, এ আশঙ্কা তাঁহার নাই। তোমার অত সাহস যদি না থাকে, আমার চরণকে দিয়া যাও।

সকালে দাদার উপর অভিমান করিয়া কুসুম উনানে জল ঢালিয়া দিয়াছিল, আর তাহা জ্বলে নাই। সারাদিন অভুক্ত। ভয়ে ভাবনায় সহস্রবার ঘর-বার করিয়া যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কেহ আসিবে এ ভরসা আর যখন রহিল না এবং এই নির্জন নিস্তব্ধ বাটীতে সমস্ত রাত্রি নিজেকে নিছক একাকী কল্পনা করিয়া যখন বারংবার তাহার গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল, এমনি সময়ে বাহিরে চরণের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের মাতৃ-সম্বোধন শুনিয়া তাহার জলমগ্ন মন অতল জলে যেন অকস্মাৎ মাটিতে পা দিয়া দাঁড়াইল।

সে ছুটিয়া আসিয়া চরণকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তার মুখ নিজের মুখের উপর রাখিয়া, সে যে একলা নহে, ইহাই প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

চরণ চাকরের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাত্রে আহারাদির পরে কুঞ্জনাথের নূতন দোকানে তাহার স্থান করা হইল। বিছানায় শুইয়া ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া কুসুম নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া শেষে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ

চরণ, তোমার বাবা কি কচ্ছেন?

চরণ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার জামার পকেট হইতে একটি ছোট পুঁটুলি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, আমি ভুলে গেছি মা, বাবা তোমাকে দিলেন।

কুসুম হাতে লইয়া বুঝিল, তাহাতে টাকা আছে।

চরণ কহিল, দিয়েই বাবা চলে গেলেন।

কুসুম ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা থেকে চলে গেলেন রে?

চরণ হাত তুলিয়া বলিল, ঐ যে হোথা থেকে।

এ-পারে এসেছিলেন তিনি?

চরণ মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, এসেছিলেন ত।

কুসুম আর প্রশ্ন করিল না। নিদারুণ অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। সেই যেদিন দ্বিপ্রহরে তিনি একবিন্দু জল পর্যন্ত না খাইয়া চরণকে লইয়া চলিয়া গেলেন, সে-ও রাগ করিয়া দ্বিতীয় অনুরোধ করিল না, বরং শক্ত কথা শুনাইয়া দিল, তখন হইতে আর একটি দিনও তিনি দেখা দিলেন না।

আগে এই পথে তাঁহার কত প্রয়োজন ছিল, এখন সে প্রয়োজন একেবারে মিটিয়া গিয়াছে। তাঁহার মিটিতে পারে, কিন্তু অর্ন্তযামী জানেন, সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা কাটাইতেছে। পথে গরুর গাড়ির শব্দ শুনিলেও তাহার শিরার রক্ত কিভাবে উদ্দাম হইয়া উঠে এবং কি আশা করিয়া সে আড়ালে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। দাদার বিবাহের রাত্রে আসিলেন না, আজ আসিয়াও দ্বারের বাহির হইতে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার সেদিনের কথা মনে পড়িল। দাদা যেদিন বালা ফিরাইতে গিয়া তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া আসিয়াছিল, ভগবান তাহাদের জিনিস তাহাদিগকেই প্রত্যর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

অবশেষে সত্যই এই যদি তাঁহার মনের ভাব হইয়া থাকে! সে নিজে আঘাত দিতে ত বাকি রাখে নাই! বারংবার প্রত্যাখান করিয়াছে, মাকেও অপমান

করিতে ছাড়ে নাই। ক্ষণকালের নিমিত্ত সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না, সেদিন এত বড় দুর্মতি তাহার কি করিয়া হইয়াছিল! যে সম্বন্ধে সে চিরদিন প্রাণপণে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহারি বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত দেহ-মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তর্ক করিতে লাগিল; কেন, একি আমার নিজের হাতে-গড়া সম্বন্ধ যে, আমি 'না-না' করিলেই তাহা উড়িয়া যাইবে! তাই যদি যাইবে, সত্যই তিনি যদি স্বামী নন, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আমার, অন্তরের সমস্ত কামনা আমার, তাঁহারি উপরে এমন করিয়া একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে কি জন্য? শুধু একটি দিনের দুটো তুচ্ছ সাংসারিক কথাবার্তায়, একটি বেলার অতি ক্ষুদ্র একটুখানি সেবায় এত ভালবাসা আসিল কোথা দিয়া? সে জোর করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল—কখন সত্য নয়, আমার দুর্নাম কিছুতেই সত্য হইতে পারে না, এ আমি যে-কোন শপথ করিয়া বলিতে পারি। মা শুধু অপমানের জ্বালায় আত্মহারা হইয়া এই দুরপনেয় কলঙ্ক আমার সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার মনে মনে বলিল, মা মরিয়াছে, সত্য-মিথ্যা প্রমাণ হইবার আর পথ নাই, কিন্তু আমি যাই বলি না কেন, তিনি নিজে ত জানেন, আমিই তাঁর ধর্মপত্নী, তবে কেন তিনি আমার এই অন্যায় স্পর্ধা গ্রাহ্য করিবেন? কেন জোর করিয়া আসেন না? কেন আমার সমস্ত দর্প পা দিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়িইয়া দিয়া যেথায় ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যান না? অস্বীকার করিবার, প্রতিবাদ করিবার আমি কেহ নয়, কিন্তু তাহা মানিয়া লইবার অধিকার তাঁহারও ত নাই!

হঠাৎ তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেই বক্ষলগ্ন চরণের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—কি মা?

কুসুম তাহাকে বুকে চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, কাকে বেশি ভালবাসিস বল্ ত চরণ? তোর বাবাকে, না আমাকে?

চরণ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমাকে মা।

বড় হয়ে তোর মাকে খেতে দিবি চরণ?

হাঁ, দেবো।

তোর বাবা যখন আমাকে তাড়িয়ে দেবে, তখন মাকে আশ্রয় দিবি ত?

হাঁ, দেবো।

কোন্ অবস্থায় কি দিতে হইবে, ইহা সে বোঝে নাই, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নূতন মাকে তাহার অদেয় কিছু নাই, ইহা সে বুঝিয়াছিল।

কুসুমের চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চরণ ঘুমাইয়া পড়িলে, সে চোখ মুছিয়া তাহার পানে চাহিয়া মনে মনে কহিল, ভয় কি! আমার ছেলে আছে, আর কেহ আশ্রয় না দিক, সে দেবেই।

পরদিন সূর্যোদয়ের কিছু পরে মাতাপুত্র নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াই দেখিল, এক প্রৌঢ়া নারী প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছেন এবং কুঞ্জনাথ সবিনয়ে যথাযোগ্য উত্তর দিতেছে। ইনি কুঞ্জনাথের শাশুড়ি। শুধু কৌতুহলবশে জামাতার কুটীরখানি দেখিতে আসেন নাই, নিজের চোখে দেখিয়া নিশ্চয় করিতে আসিয়াছেন, একমাত্র কন্যা-রত্নকে কোনদিন এখানে পাঠানো নিরাপদ কি না।

হঠাৎ কুসুমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার সিক্ত বসনে যৌবন-শ্রী আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। দেহের তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ভিজা কাপড় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আর্দ্র এলোচুলের রাশি সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া জানু স্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছিল। তাহার বামকক্ষে পূর্ণ কলস, ডান হাতে চরণের বাম হাত ধরা। তাহার হাতেও একটি ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ঘটি। সংসারে এমন মাতৃমূর্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে এবং যখন পড়ে, তখন অবাক হইয়াই চাহিয়া থাকিতে হয়। কুঞ্জনাথও হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া কুসুমের লজ্জা করিয়া উঠিল, সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই কুঞ্জর শাশুড়ি বলিয়া উঠিলেন, এই কুসুম বুঝি?

কুঞ্জ খুশি হইয়া কহিল, হাঁ মা, আমার বোন।

সমস্ত প্রাঙ্গণটাই গোময় দিয়া নিকানো, তাই কুসুম সেইখানেই ঘড়াটা নামাইয়া রাখিয়া প্রণাম করিল। মায়ের দেখাদেখি চরণও প্রণাম করিল।

তিনি বলিলেন, এ ছেলেটিকে কোথায় দেখেচি যেন।

ছেলেটি তৎক্ষনাৎ আত্মপরিচয় দিয়া কহিল, আমি চরণ। ঠাকুমার সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে মামাবাবুর মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম।

কুসুম সস্নেহে হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল, ছি বাবা, বলতে নেই! মামীমাকে দেখতে গিয়েছিলুম বলতে হয়।

কুঞ্জর শাশুড়ি বলিলেন, বেন্দা বোষ্টোমের ছেলে বুঝি? এককোঁটা ছোঁড়ার কথা দেখ!

দারুণ বিস্ময়ে কুসুমের হাসিমুখ একমুহূর্তে কালি হইয়া গেল। সে একবার দাদার মুখের প্রতি চাহিল, একবার এই নিরতিশয় অশিক্ষিতা অপ্রিয়বাদিনীর মুখের প্রতি চাহিল, তার পর, ঘড়া তুলিয়া লইয়া ছেলের হাত ধরিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। অকস্মাৎ এ কি ব্যাপার হইয়া গেল!

কুঞ্জ নির্বোধ হইলেও শাশুড়ির এত বড় রুক্ষ কথাটা তাহার কানে বাজিল, বিশেষ ভগিনীকে ভাল করিয়াই চিনিত, তাহার মুখ দেখিয়া মনের কথা স্পষ্ট অনুমান করিয়া সে অন্তরে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সে বুঝিয়াছিল, কুসুম ইহাকে আর কিছুতেই দেখিতে পারিবে না। তাহার শাশুড়িও মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। ঠিক এইরূপ বলা তাঁহারও অভিপ্রায় ছিল না। শুধু শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

রান্নাঘর হইতে কুসুম গোকুলের বিধবার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। বয়স চল্লিশ পূর্ণ হয় নাই। পরনে থান কাপড়, কিন্তু গলায় সোনার হার, কানে মাকড়ি, বাহুতে তাগা এবং বাজু-নিজের শাশুড়ির সহিত তুলনা করিয়া তাহার ঘৃণা বোধ হইল।

দাদার সহিত তাহার কথাবার্তা হইতেছিল, কি কথা তাহা শুনিতে না পাইলেও, ইহা যে তাহারই সম্বন্ধে হইতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিল।

তিনি পান এবং দোক্তাটা কিছু বেশি খান। সকাল হইতে শুরু করিয়া সারাদিনটাই সেটা ঘনঘন চলিতে লাগিল। স্নানান্তে তিলকসেবা অনুষ্ঠানটি নিখুঁত করিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই দুটি ব্যাপারের সমস্ত আয়োজন সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। ছোট আরশিটি পর্যন্ত ভুলিয়া আসেন নাই।

কুসুম নিত্যপূজা সারিয়া রাঁধিতে বসিয়াছিল,তিনি কাছে আসিয়া বসিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, কৈ গা, তোমার গলায় মালা নেই, তেলকসেবা করলে না, কি রকম বোষ্টমের মেয়ে তুমি বাছা?

কুসুম সংক্ষেপে কহিল, আমি ওসব করিনে।

করিনে বললে চলবে কেন? লোকে তোমার হাতে জল পর্যন্ত খাবে না যে।

কুসুম ফিরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার তাহলে আলাদা রান্নার যোগাড় করে দি?

আমি আপনার লোক, তোমার হাতে না হয় খেলুম—কিন্তু পরে খাবে না ত!

কুসুম জবাব দিল না।

কুঞ্জ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চরণ কখন এল কুসুম?

কাল সন্ধ্যার সময়।

কুঞ্জর শাশুড়ি কহিলেন, এই শুনি, বেন্দা বোষ্টম আর নেবে না, কিন্তু ছেলে-চাকর পাঠিয়ে দিয়েচে ত!

কুঞ্জ আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি কোথায় শুনলে মা?

মা গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, আমার আরও চারটে চোখ-কান আছে। তা সত্যি কথা বাছা। তারা এত সাধাসাধি হাঁটাহাঁটি করলে তবু তোমার বোন রাজি

হল না। লোকে নানা কথা বলবেই ত। পাড়ার পাঁচজন ছেলে-ছোকরা আছে, তোমার বোনের এই সোমত্ত বয়স, এমন কাঁচা-সোনার রঙ–লোকে বলে, মন না মতি, পা ফস্কাতে, মন টলতে কতক্ষণ বাছা?

কুঞ্জ সায় দিয়া বলিল, সে ঠিক কথা মা।

কুসুম সহসা মুখ তুলিয়া ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, তুমি এখানে বসে কি কচ্চ দাদা! উঠে যাও।

কুঞ্জ থতমত খাইয়া উঠিতে গেল, কিন্তু তাহার শাশুড়ি উষ্ণ হইয়া বলিলেন, দাদাকে ঢাকলেই ত আর লোকের চোখ ঢাকা পড়বে না বাছা! এই যে তুমি নদীতে চান করে, ভিজে কাপড়ে চুল এলিয়ে দিয়ে এলে, ও দেখলে মুনির মন টলে কি না, তোমার দাদাই বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি?

কুসুম চেঁচাইয়া উঠিল, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনো না—যাও এখান থেকে।

তাহার চিৎকার ও চোখমুখ দেখিয়া কুঞ্জ শশব্যস্তে উঠিয়া পলাইল। কুসুম উনান হইতে তরকারির কড়াটা দুম করিয়া নীচে নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কুঞ্জর শাশুড়ি মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সমকক্ষ কলহ-বীর সংসারে নাই, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা; এই সহায়-সম্বলহীন মেয়েটা তাঁহাকে যে হতভম্ব করিয়া দিয়া উঠিয়া যাইতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কেন, তাহা না বুঝিলেও সেদিন দাদার শাশুড়ি যে বিবাদ-সঙ্কল্প করিয়াই এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাতে কুসুমের সন্দেহ ছিল না। তা ছাড়া, তাঁহার বলার মর্মটা ঠিক এই রকম শুনাইল, যেন বৃন্দাবন একসময়ে গ্রহণেচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কুসুম বিশেষ কোন গূঢ় কারণে যায় নাই। সেই গূঢ় কারণটি সম্ভবতঃ কি, তাহা তাঁহার ত অগোচর নাই-ই, বৃন্দাবন নিজেও আভাস পাইয়া সে প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ইঙ্গিতই কুসুমকে অমন আত্মহারা করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি অমন করিয়া ঘর হইতে চলিয়া যাওয়াটা তাহারো যে ভাল কাজ হয় নাই, ইহা সে নিজেও টের পাইয়াছিল।

কুঞ্জর শাশুড়ি সেদিন আহার করেন নাই, শেষে অনেক সাধ্যসাধনায়, অনেক ঘাট-মানায় রাত্রে করিয়াছিলেন। তাঁহার মান রক্ষার জন্য কুঞ্জ সমস্তদিন ভগিনীকে ভৎর্সনা করিয়াছিল, কিন্তু রাগারাগি, মান-অভিমান সমাপ্ত হইবার পরেও তাহাকে একবার খাইতে বলে নাই। পরদিন বাটী ফিরিবার পূর্বে, কুসুম প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইলে কুঞ্জর শাশুড়ি কথা কহেন নাই এবং জামাইকে উপলক্ষ করিয়া কহিয়াছিলেন, কুঞ্জনাথকে ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পত্তি দেখতে হবে, এখানে বোন আগলে বসে থাকলেই ত তার চলবে না!

কুসুমের দিক হইতে এ কথার জবাব ছিল না; তাই সে নিরুত্তর অধোমুখে শুনিয়া গিয়াছিল। সত্যই ত! দাদা এদিক ওদিক দু'দিক সামলাইবে কি করিয়া?

তখন হইতে প্রায় মাস-দুই গত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে কুঞ্জকে তাহার শাশুড়ি যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এখন প্রায়ই সে এখানে থাকে না। যখন থাকে, তখনও ভাল করিয়া কথা কহে না। কুসুম ভাবে, এমন মানুষ এমন হইয়া গেল কিরূপে? শুধু যদি সে জানিত, সংসারে ইহারাই এরূপ হয়,

এতটা পরিবর্তন তাহারি মত সরল অল্পবুদ্ধি লোকের দ্বারাই সম্ভব, দুঃখ বোধ করি তাহার এমন অসহ্য হইয়া উঠিত না। ভাই-বোনের সে স্নেহ নাই, এখন কলহও হয় না।

কলহ করিতে কুসুমের আর প্রবৃত্তি হয় না, সাহসও হয় না। সেদিন এক রাত্রি বাড়িতে একা থাকিতে সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন কত রাত্রিই একা থাকিতে হয়। অবশ্য দুঃখে পড়িয়া তাহার ভয়ও ভাঙ্গিয়াছে।

তথাপি এ-সব দুঃখও সে তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সে যে দাদার গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই তাহাকে উঠিতে বসিতে বিঁধে। রহিয়া রহিয়া কেবলি মনে হয়, হঠাৎ সে মরিয়া গেলেও, বোধ করি দাদা একবার কাঁদিবে না— একফোঁটা চোখের জলও ফেলিবে না। ভবিষ্যতে দাদার এই নিষ্ঠুর ত্রুটি সে তখনি নিজের চোখের জল দিয়া ক্ষালন করিয়া দিতে ঘরে দোর দিয়া বসে আর সেদিন দোর খোলে না। হৃদয় বড় ভারাতুর হইয়া উঠিলে চরণের কথা মনে করে। শুধু সে-ই মা মা করিয়া যখন-তখন ছুটিয়া আসে, এবং কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।

তাহারি হাতে একদিন সে অনেক সঙ্কোচ এড়াইয়া বৃন্দাবনকে একখানি চিঠি দিয়াছিল, তাহাতে সে ইঙ্গিত ছিল, বৃন্দাবনের কাছে তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। কারণ যে প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করিয়া কুসুম পথ চাহিয়া রহিল, তাহা ত আসিলই না, দু'ছত্র কাগজে-লেখা জবাবও আসিল না। শুধু আসিল কিছু টাকা। বাধ্য হইয়া, নিরুপায় হইয়া, কুসুমকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল।

কাল রাত্রে কুঞ্জ ঘরে আসিয়াছিল, সকালেই ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিতে কুসুম কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজকাল কোনো বিষয়েই দাদাকে সে অনুরোধ করে না, বাধাও দেয় না। আজ কি যে হইল, মৃদুকণ্ঠে বলিয়া বসিল, এক্ষণি যাবে দাদা? আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না, দুটো খেয়ে যাও না!

কুঞ্জ ঘাড় ফিরাইয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, যা ভেবেচি তাই। অমনি পেছু ডেকে বসলি?

দায়ে পড়িয়া কুসুম অনেক সহিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু এই অকারণ মুখ-বিকৃতিতে তাহার সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া গেল, সে পালটা মুখ-বিকৃতি করিল না বটে, কিন্তু অতি কঠোর-স্বরে বলিল, তোমার ভয় নেই দাদা, তুমি মরবে না। না হলে, আজ পর্যন্ত যত পেছু ডেকেচি, মানুষ হলে মরে যেতে।

আমি মানুষ নই?

না। কুকুর-বেড়ালও নও-তারা তোমার চেয়ে ভাল-এমন নেমকহারাম নয়, বলিয়াই দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কুঞ্জ মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরের দরজা তেমনি খোলা পড়িয়া রহিল। সেই খোলা পথ দিয়া ঘন্টা-খানেক পরে বৃন্দাবন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।

কুঞ্জের ঘর তালা-বন্ধ, কুসুমের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ—রান্নাঘর খোলা। মুখ বাড়াইতেই একটা কুকুর আহার পরিত্যাগ করিয়া কেঁউ করিয়া লজ্জা ও আক্ষেপ জানাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

কতক রান্না হইয়াছে, কতক বাকি আছে–উনান নিবিয়া গিয়াছে। চরণ চাকরের সঙ্গে হাঁটিয়া আসিতেছিল, সুতরাং কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, মিনিট-দশেক পরে সু-উচ্চ মাতৃ-সম্বোধনে পাড়ার লোককে নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়া বাড়ি ঢুকিল। হঠাৎ ছেলের ডাকে কুসুম দোর খুলিয়া বাহির হইতেই তাহার অশ্রু-কষায়িত দুই চোখের শান্ত বিপন্ন দৃষ্টি সর্বাগ্রেই বৃন্দাবনের বিস্ময়-বিহ্বল জিজ্ঞাসু চোখের উপর গিয়া পড়িল।

হঠাৎ ইনি আসিবেন, কুসুম তাহা আশাও করে নাই, কল্পনাও করে নাই। সে এক পা পিছাইয়া গিয়া আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া, ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটা আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চরণ ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া

ধরিল। তাহাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া কুসুম একটা খুঁটির আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

চরণ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা কাঁদচে বাবা!

বৃন্দাবন তাহা টের পাইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?

কুসুম তখনও নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই ; জবাব দিতে পারিল না।

বৃন্দাবন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, দাদার সঙ্গে দেখা করতে চিঠি লিখেছিলে, কৈ তিনি?

কুসুম রুদ্ধস্বরে কহিল, মরে গেছে।

আহা, মরে গেল! কি হয়েছিল?

তাহার গম্ভীরস্বরে যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল, এই দুঃখের সময় কুসুমকে তাহা বড় বাজিল। সে নিজের অবস্থা ভুলিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, দেখ, তামাশা করো না। দেহ আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্চে, এখন ওসব ভাল লাগে না। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েচি বলে কি এমনি করে তার শোধ দিতে এলে? বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চাপা-কান্না বৃন্দাবন স্পষ্ট শুনিতে পাইল, কিন্তু ইহা তাহাকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে পাঠিয়েচ কেন?

কুসুম চোখ মুছিয়া ভারী গলায় কহিল, না এলে আমি বলি কাকে? আগে বরং নিজের কাজেও এদিকে আসতে যেতে, এখন ভুলেও আর এ-পথ মাড়াও না।

বৃন্দাবন কহিল, ভুলতে পারিনি বলেই মাড়াই নে, পারলে হয়ত মাড়াতুম। যাক, কি কথা?

এমন করে তাড়া দিলে কি বলা যায়?

বৃন্দাবন হাসিল। তার পরে শান্তকণ্ঠে কহিল, তাড়া দিইনি, ভালভাবেই জানতে চাচ্চি। যেমন করে বললে সুবিধে হয়, বেশ ত তুমি তেমনি করেই বল না।

কুসুম কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে আমি অনেকদিন অপেক্ষা করে আছি–আমি চুল এলো করে, পথেঘাটে রূপ দেখিয়ে বেড়াই, এ কথা কে রটিয়েছিল?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বৃন্দাবন ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল, আমি। তারপরে?

তুমি রটাবে এমন কথা আমি বলিনি, মনেও ভাবিনি, কিন্তু—

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল, কিন্তু সেদিন বলেওছিলে, ভেবেওছিলে। আমি বড়লোক হয়ে শুধু তোমাদের জব্দ করবার জন্যেই মাকে নিয়ে ভাইদের নিয়ে খেতে এসেছিলুম—সে পেরেচি, আজ আর পারিনে? সে অপরাধের সাজা আমার মাকে দিতে তুমিও ছাড়নি!

কুসুম নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েচে। তখন তোমাকে আমি চিনতে পারিনি।

এখন পেরেছ?

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনও চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, ভাল কথা, একটা কুকুর রান্নাঘরে ঢুকে তোমার হাড়িঁকুড়িঁ রান্নাবান্না সমস্ত যে মেরে দিয়ে গেল।

কুসুম কিছুমাত্র উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া জবাব দিল, যাক গে। আমি ত খাবো না—আগে জানলে রাঁধতেই যেতুম না।

আজ একাদশী বুঝি?

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, জানিনে। ওসব আমি করিনে।

কর না?

কুসুম তেমনি অধোমুখে নিরুত্তর রহিল।

বৃন্দাবন সন্দিগ্ধস্বরে বলিল, আগে করতে, হঠাৎ ছাড়লে কেন?

পুনঃ পুনঃ আঘাতে কুসুম অধীর হইয়া উঠিতেছিল। উত্যক্ত হইয়া কহিল, করিনে আমার ইচ্ছে বলে। জেনে শুনে কেউ নিজের সর্বনাশ করতে চায় না, সেইজন্যে। দাদার ব্যবহার অসহ্য হয়েছে, কিন্তু সত্যি বলচি, তোমার ব্যবহারে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করচে।

বৃন্দাবন কহিল, সেটা করো না। আমার ব্যবহারের বিচার পরে হবে, না হলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দাদার ব্যবহার অসহ্য হল কেন?

কুসুম ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, সে আর এক মহাভারত–তোমাকে শোনাবার আমার ধৈর্য নেই। মোট কথা, তিনি নিজের বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে আর আমাকে দেখতে শুনতে পারবেন না—তাঁর শাশুড়ির হুকুম নেই। খেতে পরতে দেওয়া বন্ধ করেচেন, চরণ তার মায়ের ভার না নিলে অনেকদিন আগেই আমাকে শুকিয়ে মরতে হতো। এখন আমি—সহসা সে থামিয়া গিয়া ভাবিয়া দেখিল, আর বলা উচিত কি না। তারপর বলিল, এখন আমি তোমাদের সম্পূর্ণ গলগ্রহ। তাই একদিন একদন্ডও এখানে আর থাকতে চাইনে।

বৃন্দাবন সহাস্যে প্রশ্ন করিল, তাই থাকতে ইচ্ছে নেই?

কুসুম একটিবার চোখ তুলিয়াই মুখ নিচু করিল। এই সহজ সহাস্য প্রশ্নের মধ্যে যতখানি খোঁচা ছিল, তাহার সমস্তটাই তাহাকে গভীরভাবে বিদ্ধ করিল।

বৃন্দাবন বলিল, চরণ তার মায়ের ভার নিশ্চয়ই নেবে, কিন্তু কোথায় থাকতে চাও তুমি?

কুসুম তেমনি নতমুখেই বলিল, কি করে জানব? তাঁরাই জানেন।

তাঁরা কে?–আমি?

কুসুম মৌনমুখে সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবন কহিল, সে হয় না। আমি তোমার কোন বিষয়েই হাত দিতে পারিনে। পারেন শুধু মা। তুমি যেমন আচরণই তাঁর সঙ্গে করে থাক না কেন, চরণের হাত ধরে যাও তাঁর কাছে—উপায় তিনি করে দেবেনই। কিন্তু, তোমার দাদা?

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মুছিয়া বলিল, বলেচি ত আমার দাদা মরে গেছেন। কিন্তু কি করে আমি দিনের বেলা পায়ে হেঁটে ভিক্ষুকের মত গ্রামে গিয়ে ঢুকব?

বৃন্দাবন বলিল, তা জানিনে, কিন্তু পারলে ভাল হত। এ ছাড়া আর কোন সোজা পথ আমি দেখতে পাইনে।

কুসুম ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আমি যাব না।

খুশি তোমার।

সংক্ষিপ্ত সরল উত্তর। ইহাতে নিহিত অর্থ বা কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নাই। এতক্ষণে কুসুম সত্যই ভয় পাইল।

বৃন্দাবন আর কিছু বলে কি না, শুনিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত সে উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর অতিশয় নম্র ও কুণ্ঠিতভাবে ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু এখানেও আমার যে আর দাঁড়াবার স্থান নেই। আমি দাদার দোষও দিতে চাইনে, কেননা নিজের অনিষ্ট করে পরের ভালো না করতে চাইলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু তুমি ত অমন করে ঝেড়ে ফেলে দিতে পার না?

বৃন্দাবন কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বেলা হল। চরণ, তুই থাকবি, না যাবি রে? থাকবি? আচ্ছা থাক্। তোমার ইচ্ছে হলে যেয়ো। আমার বিশ্বাস, ও-বাড়িতে ওর হাত ধরে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার

খুব মস্ত অপমান হতো না। যাক চললুম, বলিয়া পা বাড়াইতে কুসুম সহসা চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ সমস্ত বুঝলুম।

আমার এত বড় দুঃখের কথা মুখ ফুটে জানাতেও যখন দাঁড়িয়ে উঠে জবাব দিলে, বেলা হল চললুম, আমি কত নিরাশ্রয় তা স্পষ্ট বুঝেও যখন আশ্রয় দিতে চাইলে না, তখন তোমাকে বলবার বা আশা করবার আর কিছু নেই। তবু আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বল, সত্যি জবাব দেবে?

বৃন্দাবন ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, দেব। আমি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিনি, বরং তুমিই নিতে বারংবার অস্বীকার করেচ।

কুসুম দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, মিছে কথা। আমার কপালের দোষে কি যে দুর্মতি হয়েছিল—মার মনে আঘাত দিয়ে একবার গুরুতর অপরাধ করে আমার মা, স্বামী, পুত্র, ঘরবাড়ি সব থাকতেও আজ আমি পরের গলগ্রহ, নিরাশ্রয়। আজ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ির মুখ দেখতে পাইনি। অপরাধ আমার যত ভয়ানকই হোক, তবু ত আমি সে—বাড়ির বৌ। কি করে সেখানে আমাকে ভিখিরীর মত, দিনের বেলা সমস্ত লোকের সুমুখ দিয়ে পায়ে হেঁটে, পাঠাতে চাচ্চ? তুমি আর কোন সোজা পথ দেখতে পাওনি। কেন পাওনি জান? আমরা বড় দুঃখী, আমার মা ভিক্ষা করে আমাদের ভাই-বোন দুটিকে মানুষ করেছিলেন, দাদা উঞ্ছবৃত্তি করে দিনপাত করেন, তাই তুমি ভেবেচ, ভিখিরীর মেয়ে ভিখিরীর মতই যাবে, সে আর বেশি কথা কি! এ শুধু তোমার মস্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প। আমি বরং এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু তোমার কাছে হাত পেতে তোমার হাসি-কৌতুকের আর মালমসলা যুগিয়ে দেব না।

বৃন্দাবন অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, চললুম। আমার আর কিছুই বলবার নেই।

কুসুম তেমনিভাবে জবাব দিল—যাও। দাঁড়াও, আর একটা কথা। দয়া করে মিথ্যে বলো না—জিজ্ঞেস করি, আমার সম্বন্ধে তোমার কি কোন সন্দেহ হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ কচ্চি—

বৃন্দাবন দুই-এক পা গিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, ও কি, নিরর্থক শপথ কর কেন? আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুই শুনিনি। তাহার অর্ধ-আবরিত মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে কহিল, তা ছাড়া পরের চলাফেরা গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখা আমার স্বভাবও নয়, উচিতও নয়। তোমার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, ওই নিয়ে আলোচনা করতেও চাইনে। আমি সকলকেই ভাল মনে করি, তোমাকেও মন্দ মনে করিনে, বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কুসুম বজ্রাহতের ন্যায় নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

চরণ কহিল, মা, নদীতে নাইতে যাবে না?

কুসুম কথা কহিল না, তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া এক-পা এক-পা করিয়া ঘরে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িয়া তাহাকে প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অনেকদিন কাটিয়াছে। মাঘ শেষ হইয়া ফাল্গুন আসিয়া পড়িল, চরণ সেই যে গিয়াছে, আর আসিল না। তাহাকে যে জোর করিয়া আসিতে দেওয়া হয় না, ইহা অতি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ কোনরূপ সম্বন্ধ আর তাঁহারা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ওদিকের কোন সংবাদ নাই, সেও আর কখনও চিঠিপত্র লিখিয়া নিজেকে অপমানিত করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। দাদার সেই একই ভাব—সর্বরকমেই প্রাণ যেন কুসুমের বাহির হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। সেই অবধি প্রকাশ্যে বাটীর বাহির হওয়া কিংবা পূর্বের ন্যায় সঙ্গিনীদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে। রাত্রি থাকিতেই নদী হইতে স্নান করিয়া জল লইয়া আসে, হাটের দিন গোপালের মা হাট-বাজার করিয়া দেয়, —এমনি করিয়া বাহিরের সমস্ত সংস্রব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, তাহার গুরুভারাক্রান্ত সুদীর্ঘ দিন-রাত্রিগুলি যথার্থই বড় দুঃখে কাটিতেছিল।

সে খুব ভাল সূচের কাজ করিতে পারিত। যে যাহা পারিশ্রমিক দিত, তাহাই হাসিমুখে গ্রহণ করিত এবং কেহ দিতে ভুলিয়া গেলে সেও ভুলিয়া যাইত। এই সমস্ত মহৎ গুণ থাকায় পাড়ার অধিকাংশ মশারি, বালিশের অড়, বিছানার চাদর সে-ই সিলাই করিত। আজ অপরাহ্নবেলায় নিজের ঘরের সুমুখে মাদুর পাতিয়া একটা অর্ধ-সমাপ্ত মশারি শেষ করিতে বসিয়াছিল। হাতের সূচ তাহার অচল হইয়া রহিল, সে সেই প্রথম দিনের আগাগোড়া ঘটনা লইয়া নিজের মনে খেলা করিতে লাগিল।

যেদিন তাহারা সদলবলে পলাতক দাদার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং বড় দায়ে ঠেকিয়া তাহাকে লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়া মুখরার মত প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ করিতে হইয়াছিল—সেই সব কথা। দুঃখ তাহার যখনই

অসহ্য হইয়া উঠিত, তখনই সে সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া এই স্মৃতি লইয়া চুপ করিয়া বসিত। মা যেমন তাঁহার একমাত্র শিশুকে লইয়া নানাভাবে নাড়াচাড়া করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে উপভোগ করেন, সেও তাহার এই একটিমাত্র চিন্তাকেই অনির্বচনীয় প্রীতির সহিত নানা দিক হইতে তোলাপাড়া করিয়া দেখিয়া অসীম তৃপ্তি অনুভব করিত।

তাহার সমস্ত দুঃখ তখনকার মত যেন ধুইয়া মুছিয়া যাইত। দু'জনের সেই বাদ-প্রতিবাদ, অপর সকলকে লুকাইয়া আহারের আয়োজন, তার পরে রাঁধিয়া বাড়িয়া পরিবেশন করিয়া স্বামী-দেবরদিগকে খাওয়ানো, শাশুড়ির সেবা, সকলের শেষে দিনান্তে নিজের জন্য সেই অবশিষ্ট শুষ্ক শীতল, যা হোক কিছু।

তাহার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নারীদেহ ধরিয়া ইহাপেক্ষা অধিক সুখ সে ভাবিতেও পারিত না, কামনাও করিত না। তাহার মনে হইত, যাহারা এ কার্য নিত্য করিতে পায়, এ সংসারে বুঝি তাহাদের আর কিছুই বাকি থাকে না।

তাহার পর মনে পড়িয়া গেল, শেষদিনের কথা। যেদিন তিনি সমুদয় সংস্রব ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সেদিন সে নিজেও বাধা দেয় নাই, বরং ছিঁড়িতেই সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তখন চরণের কথা ভাবে নাই। ঐ সঙ্গে সেও যে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে সরিয়া যাইতে পারে, দারুণ অভিমানে তাহা মনে পড়ে নাই। এখন যত দিন যাইতেছিল, ওই ভয়ই তাহার বুকের রক্ত পলে পলে শুকাইয়া আনিতেছিল, পাছে চরণ আর না আসিতে পায়। সত্যিই যদি সে না আসে, তবে একদণ্ডও সে বাঁচিবে কি করিয়া? আবার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, যে সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে পূর্বে ছিল, যাহা এ দুর্দিনে হয়ত তাহাকে বল দিতেও পারিত, আর তাহা নাই, একেবারে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তরবাসী সুপ্ত বিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়া অহর্নিশি তাহার কানে কানে ঘোষণা করিতেছে, সমস্ত মিথ্যা! তাহার ছেলেবেলার কলঙ্ক দুর্নাম কিছু সত্য নয়। সে

হিঁদুর মেয়ে, অতএব যাহা পাপ, যাহা অন্যায়, তাহা কোনমতেই তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও কখন হিঁদুর ঘরের মেয়ে এত ভালোবাসিতে পারে না; তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার কাজে লাগিবার জন্য সমস্ত দেহমন উন্মত্ত হইয়া উঠে না। তিনি স্বামী না হইলে ভগবান নিশ্চয়ই তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন, অন্তরের কোথাও, কোনো একটু ক্ষুদ্র কোণে এতটুকু লজ্জার বাষ্‌পও অবশিষ্ট রাখিতেন।

আজ হাটবার।

গোপালের মা বহুক্ষণ হাটে গিয়াছে, এখনি আসিবে, এইজন্য সদর দরজা খোলা ছিল; হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া কুঞ্জনাথবাবু চাকর সঙ্গে করিয়া বিলাতি জুতার মচমচ শব্দ করিয়া পাড়ার লোকের বিস্ময় ও ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া বাড়ি ঢুকিলেন। কুসুম টের পাইল, কিন্তু অশ্রুকলুষিত রাঙ্গা চোখ লজ্জায় তুলিতে পারিল না।

কুঞ্জনাথ সোজা ভগিনীর সুমুখে আসিয়া কহিল, তোর বৃন্দাবন যে আবার বিয়ে কচ্চে রে!

কুসুমের বক্ষঃস্পন্দন থামিয়া গেল, সে কাঠের মত নতমুখে বসিয়া রহিল।

কুঞ্জ গলা চড়াইয়া কহিল, কুমীরের সঙ্গে বাদ করে কি করে জলে বাস করে, আমাকে তাই একবার দেখতে হবে। ঐ নন্দা বোষ্টম, কত বড় বোষ্টমের বেটা বোষ্টম, আমি তাই দেখতে চাই, আমার জমিদারিতে বাস করে আমারই অপমান!

কুসুম কোন কথাই বুঝিতে পারিল না, অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, নন্দ বোষ্টম কে?

কে? আমার প্রজা! আমার পুকুরপাড়ে ঘর বেঁধে আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব। সেই ব্যাটার মেয়ে—এই ফাল্গুন মাসে হবে, সব নাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে—ভূতো, তামাক সাজ্।

কুসুম এতক্ষণ চোখ তোলে নাই, তাই চাকরের আগমন লক্ষ্য করে নাই, একটু সঙ্কুচিত হইয়া বসিল।

কুঞ্জ প্রশ্ন করিল, ভূতো, নন্দার মেয়েটা দেখতে কেমন রে?

ভূতো ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বেশ।

কুঞ্জ আস্ফালন করিয়া কহিল, বেশ! কখ্খন না, আমার বোনের মত দেখতে? দ্যুৎ—এমন রূপ তুই কখন চোখে দেখেচিস?

ভূতো জবাব দিবার পূর্বেই কুসুম ঘরে উঠিয়া গেল।

খানিক পরে কুঞ্জ তামাক টানিতে টানিতে ঘরের সুমুখে আসিয়া বলিল, কি রে কুসি, বলেছিলুম না! বেন্দা বৈরাগীর মত অমন নেমকহারাম বজ্জাত আর দুটি নেই—কেমন ফলল কিনা? মা বলেন, বেদ মিথ্যে হবে, কিন্তু আমার কুঞ্জনাথের বচন মিথ্যে হবে না—ভূতো, মা বলে না?

ঘরের ভিতর হইতে কোন জবাব আসিল না, কিন্তু কি-একরকমের অস্পষ্ট আওয়াজ আসিতে লাগিল।

কুঞ্জ কি মনে করিয়া, হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া, দোর ঠেলিয়া, ঘরের ভেতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল; ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া বহুকালের পর হঠাৎ আজ তাহার চোখ দুটা জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে শয্যার একাংশে গিয়া বসিল এবং বোনের মাথায় একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুই কিছু ভয় করিস নে কুসুম, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তখন দেখতে পাবি, তোর দাদা যা বলে

তাই করে কি না। কিন্তু তুইও ত শ্বশুরঘর করতে চাইলি নি বোন—আমরা সবাই মিলে কত সাধাসাধি করলুম, তুই একটা কথাও কারুর কানে তুললি নে।

কুঞ্জর শেষ কথাগুলো অশ্রুভারে জড়াইয়া আসিল।

কুসুম আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না—হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার জন্য আজও যে দাদার স্নেহের লেশমাত্রও অবশিষ্ট আছে, এ আশা সে অনেকদিন ছাড়িয়াছিল।

কুঞ্জর চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। কুঞ্জ আর একবার ভাল করিয়া জামার হাতায় চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, তুই অস্থির হসনে বোন, আমি বলে যাচ্ছি, এ বিয়ে কোনমতেই হতে দেব না।

এবার কুসুম কথা কহিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি এতে হাত দিয়ো না দাদা।

কুঞ্জ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, হাত দেব না? আমার চোখের সামনে বিয়ে হবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব? তুই বলচিস কি কুসুম?

না দাদা, তুমি বাধা দিতে পাবে না।

কুঞ্জ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, বাধা দেব না? নিশ্চয় দেব। এতে তোর অপমান না হয় না হবে, কিন্তু আমি সইতে পারব না। আমার প্রজা–তুই বলিস কি রে! লোকে শুনলে আমাকে ছি ছি করবে না?

কুসুম বালিশে মুখ লুকাইয়া বারংবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, আমি মানা করচি দাদা, তুমি কিছুতেই হাত দিও না। আমাদের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই, আর ঘাঁটাঘাঁটি করে কেলেঙ্কারি বাড়িয়ো না–বিয়ে হচ্চে হোক।

কুঞ্জ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, না।

না কেন? আমাকে ত্যাগ করে তিনি বিয়ে করেছিলেন, না হয় আর একবার করবেন। আমার পক্ষে দুই-ই সমান। তোমার পায়ে ধরচি দাদা, অনর্থক বাধা দিয়ে হাঙ্গামা করে আমার সমস্ত সম্ভ্রম নষ্ট করে দিয়ো না–তিনি যাতে সুখী হন, তাই ভাল।

হুঁ, বলিয়া কুঞ্জ খানিকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, জানি ত তোকে চিরকাল। একবার 'না' বললে কার বাপের সাধ্যি 'হাঁ' বলায়। তুই কারো কথা শুনবি নে, কিন্তু তোর কথা সবাইকে শুনতে হবে।

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

কুঞ্জ বলিতে লাগিল, আর ধরলে কথাটা মিথ্যা নয়। তুই যখন কিছুতেই শ্বশুরঘর করবি নে, তখন তাদের সংসারই বা চলে কি করে? এখন না হয় মা আছেন, কিন্তু তিনি ত চিরকাল বেঁচে থাকবেন না।

কুসুম কথা কহিল না।

কুঞ্জ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা কুসুম, সে বিয়ে করুক, না করুক, তুই তবে এত কাঁদচিস্ কেন?

ইহার আর জবাব কি?

অন্ধকারে কুঞ্জ দেখিতে পাইল না কুসুমের চোখের জল কমিয়া আসিয়াছিল, এই প্রশ্নে পুনরায় তাহা প্রবলবেগে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কুঞ্জ উঠিয়া গেলে কুসুম সেদিনের কথাগুলো স্মরণ করিয়া লজ্জায় ধিক্কারে মনে মনে মরিয়া যাইতে লাগিল। ছি ছি, মরিলেও ত এ লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতির পথ নাই। এজন্যই তাঁহার আশ্রয় দিবার সাধ্য ছিল না, অথচ সে কতই না সাধিয়াছিল। ওদিকে যখন নূতন করিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, তখন না জানিয়া সে মুখ ফুটিয়া নিজেকে বাড়ির বধূ বলিয়া দর্প করিয়াছিল। যেখানে বিন্দু পরিমাণ ভালবাসা ছিল না, সেখানে সে পর্বত-প্রমাণ

অভিমান করিয়াছিল। ভগবান! এই অসহ্য দুঃখের উপর কি মর্মান্তিক লজ্জাই না তাহার মাথায় চাপাইয়া দিলে!

তাহার বুক চিরিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল–উঃ, এইজন্যই আমার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নাই! আর আমি লজ্জাহীনা, তাহাতে শপথ করিতে গিয়াছিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ, যাহারা কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া মাথা গরম করাকে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া ঘৃণা করে। ইহারা হাজার রাগ হইলেও সামলাইতে পারে এবং কোন কারণেই প্রতিপক্ষের রাগারাগি হাঁকাহাঁকি বা উচ্চ তর্কে যোগ দিয়া লোক জড় করিতে চাহে না। তথাপি সেদিন কুসুমের বারংবার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও অন্যায় অভিযোগে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলা নিরর্থক রূঢ় কথা বলিয়া আসিয়া তাহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। তাই পরদিন প্রভাতেই চরণকে আনিবার ছলে একজন দাসী, ভৃত্য ও গাড়ি পাঠাইয়া দিয়া যথার্থই আশা করিয়াছিল, বুদ্ধিমতী কুসুম এ ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিবে এবং হয়ত আসিবেও। যদি সত্যই আসে, তাহা হইলে একটা দিনের জন্যও তাহাকে লইয়া যে কি উপায় হইবে, এ দুরূহ প্রশ্নের এই বলিয়া মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছিল–যদি আসে, তখন মা আছেন। জননীর কার্যকুশলতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। যত বড় অবস্থাসংকটই হোক, কোন-না-কোন উপায়ে তিনি সবদিক বজায় রাখিয়া যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেনই। এই বিশ্বাসের জোরেই মাকে একটি কথা না বলিয়াই গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং আশায় আনন্দে লজ্জায় ভয়ে অধীর হইয়া পথ চাহিয়া ছিল, অন্ততঃ মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষার জন্যও আজ সে আসিবে।

দুপুরবেলা গাড়ি একা চরণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, বৃন্দাবন চন্ডীমন্ডপের ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে তাহার পাঠশালায় পূর্বের শৃঙ্খলা ছিল না। পন্ডিতমশায়ের দারুণ অমনোযোগে অনেক পোড়ো কামাই করিতে শুরু করিয়াছিল এবং যাহারা আসিত, তাহাদেরও পুকুরে তালপাতা ধুইয়া আনিতেই দিন কাটিয়া যাইত।

শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন ছিল শুধু ঠাকুরের আরতি-শেষে প্রসাদ ভক্ষণে। এটা বোধ করি, অকৃত্রিম ভক্তিবশতঃই–ছাত্রেরা এ সময়ে অনুপস্থিত থাকিয়া গৌর-নিতায়ের অমর্যাদা করিতে পছন্দ করিত না।

এমনি সময়ে অকস্মাৎ একদিন বৃন্দাবন তাহার পাঠশালায় সমুদয় চিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিল। পোড়োদের তালপাতা ধুইয়া আনিবার সময় ছয় ঘন্টা হইতে কমাইয়া পনের মিনিট করিল এবং সারাদিন অদর্শনের পর শুধু আরতির সময়টায় গৌরাঙ্গপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় ঠাকুর-দালান ছাইয়া না ফেলে সেদিকেও খরদৃষ্টি রাখিল।

দিন-দশেক পরে একদিন বৈকালে বৃন্দাবনের তত্ত্বাবধানে পোড়োরা সারি দিয়া দাঁড়াইয়া তারস্বরে গণিত-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছিল, একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন সসম্ভ্রমে উঠিয়া, বসিতে আসন দিয়া চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না।

আগন্তুক তারই সমবয়সী। আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কি ভায়া, চিনতে পারলে না?

বৃন্দাবন সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, কৈ না।

তিনি বলিলেন, আমার কাজ আছে তা পরে জানাব। মামার চিঠিতে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনে বিদেশ যাবার পূর্বে একবার দেখতে এলাম–আমি কেশব।

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বাল্যসুহৃদকে আলিঙ্গন করিল। তাহার ভূতপূর্ব ইংরাজী-শিক্ষক দুর্গাদাসবাবুর ভাগিনেয় ইনি। পনর-ষোল বৎসর পূর্বে এখানে পাঁচ-ছয় মাস ছিলেন, সেই সময় উভয়ের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। দুর্গাদাসবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কেশব চলিয়া যায়, সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। তথাপি কেহই কাহাকেও বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহার শিক্ষকের মুখে বৃন্দাবন প্রায়ই এই বাল্যবন্ধুটির সংবাদ পাইতেছিল।

কেশব পাঁচ-ছয় বৎসর হইল এম. এ. পাশ করিয়া কলেজের শিক্ষকতা করিতেছিল, সম্প্রতি সরকারী চাকরিতে বিদেশ যাইতেছে।

কুশলাদি প্রশ্নের পর সে কহিল, আমার মামা মিথ্যে কথা ত দূরের কথা, কখনো বাড়িয়েও বলেন না; গতবারে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন; কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ যথার্থ মানুষ হয়েচে কিনা তিনি জানেন না। যথার্থ মানুষ কখনও চোখে দেখিনি ভাই, তাই দেশ ছেড়ে যাবার আগে তোমাকে দেখতে এসেছি।

কথাগুলা বন্ধুর মুখ দিয়া বাহির হইলেও বৃন্দাবন লজ্জায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কি জবাব দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সংসারে কোন মানুষই যে তাহার সম্বন্ধে এতবড় স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিশেষতঃ এই স্তুতি তাহারই পরম পূজনীয় শিক্ষকের মুখ দিয়া প্রথম প্রচারিত হইবার সংবাদে যথার্থই সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কেশব বুঝিয়া বলিল, যাক, যাতে লজ্জা পাও, আর তা বলব না, শুধু মামার মতটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন কাজের কথা বলি। পাঠশালা খুলেচ, শুনি মাইনে নাও না, পোড়োদের বই-টই কাপড়-চোপড় পর্যন্ত যোগাও– এতে আমিও রাজি ছিলাম, কিন্তু ছাত্র জোটাতে পারলাম না। বলি, এতগুলি ছেলে যোগাড় করলে কি করে বল ত ভায়া?

বৃন্দাবন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

কেশব হাসিয়া বলিল, খুলে বলচি–নইলে বুঝবে না। আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি, যদি দেশের কোন কাজ থাকে ত ইতর-সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক পণ্ডশ্রম। অন্ততঃ আমার ত এই মত যে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাবনা তারা আপনি ভাববে। ইঞ্জিনে স্টিম হলে তবে গাড়ি চলে, নইলে এতবড় জড় পদার্থটাকে জনকতক ভদ্রলোকে মিলে গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি করে এক চুলও

নড়াতে পারবে না। যাক, তুমি এ-সব জানই, নইলে গাঁটের পয়সা খরচ করে পাঠশালা খুলতে না। আমি এইজন্যে বিয়ে পর্য্যন্ত করিনি হে, তোমাদের মত আমাদের গাঁয়েও লেখাপড়া শেখবার বালাই নেই, তাই প্রথমে একটা পাঠশালা খুলে–শেষে একটা স্কুলে দাঁড় করাব মনে করি–তা আমার পাঠশালা চলল না–ছেলে জুটল না। আমাদের গাঁয়ের ছোটলোকগুলো এমনি শয়তান যে, কোনমতেই ছেলেদের পড়তে দিতে চায় না। নিজের মানসম্ভ্রম নষ্ট করে দিনকতক ছোটলোকদের বাড়ি পর্যন্ত ঘুরেছিলাম–না, তবুও না।

বৃন্দাবনের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে বলিল, ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায় নি। কিন্তু তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মান-ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয়নি।

তাহার কথার খোঁচাটা কেশবকে সম্পূর্ণ বিঁধিল। সে ভারী অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল, না হে না–তোমাকে–তোমাদের সে কি কথা! ছি ছি! তা আমি বলিনি, সে কথা নয়–কি জানো–

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে বলনি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেচ। আমরা সব তাঁতি কামার গয়লা চাষা–তাঁত বুনি, লাঙ্গল ঠেলি, গরু চরাই–জামাজোড়া পরতে পাইনে, সরকারী আফিসে দোর গোড়ায় যেতে পারিনে, কাজেই তোমরা আমাদের ছোটলোক বলে ডাকো–ভাল কাজেও আমাদের বাড়িতে ঢুকলে তোমাদের মত উচ্চশিক্ষিত সদাশয় লোকের সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যায়।

কেশব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, বৃন্দাবন, সত্যি বলচি ভাই, তোমাকে আমি চাষাভূষোর দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করেই অমন কথা বলে ফেলেছি। যদি জানতুম, তুমি নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাগ করবে, কখন এ কথা মুখ দিয়ে বার করতাম না।

বৃন্দাবন কহিল, তাও জানি। কিন্তু তুমি আলাদা করে নিলেই ত আলাদা হতে পারিনে ভাই। আমার সাতপুরুষ এদেশের ছোটলোকদের সঙ্গে মিলে রয়েচে। আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ-আবাদ করি। কেশব, এইজন্যই তোমার পাঠশালায় ছেলে জোটেনি–আমার পাঠশালায় জুটেচে; আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল-ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেচে–তোমার কাছে যেতে ভরসা করেনি। আমরা অশিক্ষিত দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করতে পারিনে, তোমরা ছোটলোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তর্যামী স্বীকার করেন না; তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান না।

কেশব লজ্জায় ও ক্ষোভে অবনতমুখে শুনিতে লাগিল।

বৃন্দাবন কহিল, জানি, এতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি হয়, তবুও আমরা তোমাদের আত্মীয় শুভাকাঙক্ষী বলে মেনে নিতে ভয় পাই। দেখতে পাও না ভাই, আমাদের মধ্যে হাতুড়ে বদ্যি, হাতুড়ে পণ্ডিতই প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করে–যেমন আমি করেচি, কিন্তু তোমাদের মত বড় ডাক্তার প্রফেসারও আমল পায় না। আমাদের বুকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন, তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়া তাঁর গায়ে বেঁধে, তিনি মুখ ফেরান।

এবার কেশব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কিন্তু মুখ ফেরানো অন্যায়। আমরা বাস্তবিক তোমাদের ঘৃণা করিনে, সত্যই মঙ্গল কামনা করি। তোমাদের উচিত, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। কিসে ভাল হয়, না হয়, শিক্ষার গুণে আমরা বেশি বুঝি; তোমরাও চোখে দেখতে পাচ্চ, আমরাই সব বিষয়ে উন্নত, তখন তোমাদের কর্তব্য আমাদের কথা শোনা।

বৃন্দাবন কহিল, দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান, তা দেবতাই জানেন। সে কথা থাক্। কিন্তু তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের শুভকামনা কর না, মনিবের মত কর। তাই তোমাদের পনর-আনা লোকই মনে করে, যাতে

ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয়, তাতে চাষাভুষোর ছেলেরা অধঃপথে যায়। তোমাদের সংস্রবে লেখাপড়া শিখলে চাষার ছেলে যে বাবু হয়ে যায়, তখন অশিক্ষিত বাপ-দাদাকে মানে না, শ্রদ্ধা করে না, বিদ্যাশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ এই দেশের ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শেখো, তার পরে তাদের মঙ্গলকামনা করো, তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাতে যেয়ো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া-শেখা

ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষাভূষোকে নেহাত ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই শুধু আমাদের ভয় ভাঙ্গবে যে, আমাদেরও লেখাপড়া-শেখা ছেলেরা অশ্রদ্ধা করবে না এবং দল ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, জাতিগত ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথক হবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে না।

এ যতক্ষণ না করচ ভাই, ততক্ষণ জন্ম জন্ম অবিবাহিত থেকে হাজার জীবনের ব্রত কর না কেন, তোমার পাঠশালে ছোটলোকের ছেলে যাবে না। ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুনবে না।এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে, তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।

কেশব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, বৃন্দাবন, বোধ করি তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, যদি উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনই না থাকে, তা হলে আমাদের শত আত্মীয়তার প্রয়াসও ত কাজে লাগবে না? বিশ্বাস না করলে, আমরা কি করে বোঝাবো, আমারা আত্মীয় কিংবা পর? তার উপায় কি?

বৃন্দাবন কহিল, ঐ যে বললুম, আচার-ব্যবহারে। আমাদের ষোল-আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার বলে বর্জন করে, আমাদের বাসস্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা অর্জনের উপায়, যদি

তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, তা হলে কোনদিনই আমরা বুঝতে পারব না, তোমাদের নির্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় যথার্থই আমাদের কল্যাণ হবে। আচ্ছা কেশব, পৈতে হবার পর থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর?

না।

জুতো পায়ে দিয়ে জল খাও?

খাই।

মুসলমানের হাতের রান্না?

প্রেজুডিস্ নেই। খেতে পারি।

তা হলে আমিও বলতে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা খুলে তাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প তোমার বিড়ম্বনা–কিংবা আরও কিছু বেশি–সেটা বললে তুমি রাগ করবে?

ধৃষ্টতা?

ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কাজ করা যায় না। যাদের ভালো করবে, তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চাই, বুদ্ধি-বিবেচনায় ধর্মেকর্মে এত এগিয়ে গেলে তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু আর না, সন্ধ্যা হয়, এবার একটু পাঠশালের কাজ করি।

কর, কাল সকালেই আবার আসব, বলিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ি হইলেও কেশব শহরের লোক। বন্ধুর নিকট এই ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। উভয়ে প্রাঙ্গণে নামিতেই পোড়োর দল মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

বাল্যবন্ধুকে দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বৃন্দাবন আস্তে আস্তে বলিল, তুমি বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে নিজের তরফ থেকেও প্রণাম করেচি, ছাত্রদের তরফ থেকেও করেচি–বুঝলে ত?

কেশব সলজ্জ হাস্যে 'বুঝেচি' বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই কেশব হাজির হইয়া বলিল, বৃন্দাবন, তুমি যে যথার্থই মানুষ তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, আমারও নেই। তার পরে?

কেশব কহিল, তোমাকে উপদেশ দিচ্চিনে, সে অহঙ্কার আমার কাল ভেঙ্গে গেছে। শুধু বন্ধুর মত সবিনয়ে জিজ্ঞেস কচ্চি, এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সময় নষ্ট করে ছেলেদের শিক্ষা দিচ্চ, কিন্তু আরও কত শত সহস্র গ্রাম রয়েচে, সেখানে ক খ শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা, এ কাজ কি গভর্নমেন্টের করা উচিত নয়?

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার প্রশ্নটা ঠিক ওই পোড়োদের মত হল।

দোষের জন্য রাধুকে মারতে যাও দিকি, সে তক্ষণি দুই হাত তুলে বলবে–পণ্ডিতমশাই, মাধুও করেচে। অর্থাৎ মাধুর দোষ দেখিয়ে দিতে পারলে যেন রাধুর দোষ আর থাকে না। এই দেশজোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে ত করি ভাই, তার পরে দেখা যাবে গভর্নমেন্ট তাঁর কর্তব্য করেন কি না। নিজের কর্তব্য করার আগে পরের কর্তব্য আলোচনা করলে পাপ হয়।

কিন্তু তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জনকতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?

বৃন্দাবন বিস্মিতভাবে একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কথাটা ঠিক হল না ভাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মত মানুষ হয়, ত এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন,

বিদ্যাসাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি হয় না কেশব, বরং আশীর্বাদ কর যেন এই ছোট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্বে মানুষ দেখে মরতে পারি। আর এক কথা। আমার পাঠশালায় একটি শর্ত আছে। কাল যদি তুমি সন্ধ্যার পর উপস্থিত থাকতে ত দেখতে পেতে প্রত্যহ বাড়ি যাবার পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রই প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে তারা অন্ততঃ দুটি-একটি ছেলেকেও লেখাপড়া শেখাবে। আমার প্রতি পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে তাদের ছেলেবেলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তা হলে আমি হিসেব করে দেখেচি কেশব, বিশ বছর পরে এই বাঙ্গলাদেশে একটি লোকও মূর্খ থাকবে না।

কেশব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ–কি ভয়ানক আশা!

বৃন্দাবন বলিল, সে বলতে পার বটে। দুর্বল মুহূর্তে আমারও ভয় হয় দুরাশা, কিন্তু সবল মুহূর্তে মনে হয়, ভগবান মুখ তুলে চাইলে পূর্ণ হতে কতক্ষণ!

কেশব কহিল, বৃন্দাবন, আজ রাত্রেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে, আবার কবে দেখা হবে, ভগবান জানেন। চিঠি লিখলে জবাব দেবে বল?

এ আর বেশি কথা কি কেশব?

বেশি কথাও আছে, বলচি। যদি কখন বন্ধুর প্রয়োজন হয়, স্মরণ করবে বল?

তাও করব, বলিয়া বৃন্দাবন নত হইয়া কেশবের পদধূলি মাথায় লইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের দোল-উৎসব বৃন্দাবনের জননী খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন করিতেন। কাল তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে বৃন্দাবন অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই, মা ঘরের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিলেন, বৃন্দাবন, একবার ওঠ দিকি বাবা!

জননীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে বৃন্দাবন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা?

মা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া বলিলেন, আমি ত চিনিনে বাছা, তোর পাঠশালার একটি ছাত্তর বাইরে বসে বড় কাঁদচে–তার বাপ নাকি ভেদবমি হয়ে আর উঠতে পারচে না।

বৃন্দাবন ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবু গোয়ালার ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। পণ্ডিতমশাই, বাবা আর চেয়েও দেখচে না, কথাও বলচে না।

বৃন্দাবন সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শিবুর তখন শেষ-সময়। প্রতি বৎসর এই সময়টায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, এ বৎসর এই প্রথম। কাল সন্ধ্যা-রাত্রেই শিবু রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় এতক্ষণ পর্যন্ত টিকিয়াছিল, বৃন্দাবন আসিবার ঘণ্টাখানেক পরেই দেহত্যাগ করিল।

বাঙ্গলাদেশের প্রায় প্রতি গ্রামেই যেমন আপনা-আপনি শিক্ষিত এক-আধজন ডাক্তার বাস করেন, এ গ্রামেও গোপাল ডাক্তার ছিলেন। কাল রাত্রে তাঁহাকে ডাকিতে যাওয়া হয়। কলেরা শুনিয়া তিনি দু ভিজিট নগদ প্রার্থনা করেন। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি ঠিক জানিতেন, ধারে কারবার করিলে, এসব

রোগে তাঁহার ঔষধ খাইয়া ছোটলোকগুলা পরদিন ভিজিট বুঝাইয়া দিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। শিবুর স্ত্রীও অত রাত্রে নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া নুন-জল খাওয়াইয়া, স্বামীর শেষ চিকিৎসা সমাধা করিয়া, সারারাত্রি শিয়রে বসিয়া মা শীতলার কৃপা প্রার্থনা করে। তারপর সকালবেলা এই।

বৃন্দাবন বড়লোক, এ গ্রামে তাহাকে সবাই মান্য করিত। মৃত স্বামীর গতি করিয়া দিবার জন্য শিবুর সদ্য-বিধবা তাহার পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। শিবুর সম্বলের মধ্যে ছিল তাহার অনশন ও অর্ধাশনক্লিষ্ট হাত দুখানি এবং দুটি গাভী। তাহারই একটিকে বন্ধক রাখিয়া এ বিপদে উদ্ধার করিতে হইবে।

কোন কিছু বন্ধক না রাখিয়াও বৃন্দাবন তাহার জীবনে এমন অনেক গতি করিয়াছে, শিবুরও গতি করিয়া অপরাহ্নবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখনও বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় একটা মাদুর পাতিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল, সহসা পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, মৃত শিবুর সেই ছেলেটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আয় বোস ষষ্ঠীচরণ, বলিয়া বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল।

ছেলেটি বার-দুই ঠোঁট ফুলাইয়া ‘পন্ডিতমশাই’ বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

সদ্য-পিতৃহীন শিশুকে বৃন্দাবন কাছে টানিয়া লইতেই সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, কেষ্টাও বমি কচ্চে!

কেষ্টা তাহার ছোট ভাই, সেও মাঝে মাঝে দাদার সহিত পাঠশালে লিখিতে আসিত।

আজ রাত্রে গোপাল ডাক্তার ভিজিটের টাকা আদায় না করিয়াই বৃন্দাবনের সহিত কেষ্টাকে দেখিতে আসিলেন। তাহার নাড়ী দেখিলেন, জিভ দেখিলেন, ঔষধ দিলেন, কিন্তু অবাধ্য কেষ্টা মায়ের বুকফাটা কান্না, চিকিৎসকের

মর্যাদা কিছুই গ্রাহ্য করিল না, রাত্রি ভোর না হতেই গোপাল ডাক্তারের বিশ্ব-বিশ্রুত হাতযশ খারাপ করিয়া বাপের কাছে চলিয়া গেল।

মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া সদ্য-বিধবা জননীর মর্মান্তিক বিলাপে বৃন্দাবনের বুকের ভিতরটা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার নিজের ছেলে আছে, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরে পলাইয়া আসিয়া চরণকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিজের অন্তরের মধ্যে চাহিয়া সহস্রবার মনে মনে বলিল, মানুষের দোষের শাস্তি আর যা ইচ্ছে হয় দিয়ো ভগবান, শুধু এই শাস্তি দিয়ো না—জানি না, এ প্রার্থনা জগদীশ্বর শুনিতে পাইলেন কিনা, কিন্তু নিজে আজ সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিল, এ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি আর যাহারই থাক, তাহার নাই।

ইহার পর দিন দুই-তিন নির্বিঘ্নে কাটিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে শোনা গেল, তাহাদের প্রতিবেশী রসিক ময়রার স্ত্রী ওলাউঠায় মরমর হইয়াছে।

মা দেখিতে গিয়াছিলেন, বেলা দশটার সময় তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘণ্টা-খানেক পরে আর্ত ক্রন্দনের রোলে বুঝিতে পারা গেল, রসিকের স্ত্রী ছোট ছোট চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার গ্রামে মহামারী শুরু হইয়া গেল। যাহার পলাইবার স্থান ছিল, সে পলাইল; অধিকাংশেরই ছিল না, তাহারা ভীতশুষ্ক-মুখে সাহস টানিয়া আনিয়া কহিল, অন্নজল ফুরাইলেই যাইতে হইবে, পলাইয়া কি করিব?

বৃন্দাবনের বাড়ির সুমুখ দিয়াই গ্রামের বড় পথ, তথায় যখন-তখন ভয়ঙ্কর হরিধ্বনিতে ক্রমাগতই জানা যাইতে লাগিল, ইহাদের অনেকেরই অন্নজল প্রতিনিয়তই নিঃশেষ হইতেছে।

আশপাশের গ্রামেও দুই-একটা মৃত্যু শোনা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু বাড়লের অবস্থা প্রতি মুহূর্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

ইহার প্রধান কারণ, গ্রামের অবস্থা অন্যান্য বিষয়ে ভাল হইলেও পানীয় জলের কিছুমাত্র বন্দোবস্ত ছিল না।

নদী নাই, যে দুই-চারটা পুষ্করিণী পূর্বে উত্তম ছিল, তাহাও সংস্কার অভাবে মজিয়া উঠিয়া প্রায় অব্যবহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ কাহারো তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। গ্রামবাসীদের অনেকেরই বিশ্বাস, জলের তৃষ্ণা-নিবারণ ও আহার্য পাক করিবার ক্ষমতা থাকা পর্যন্ত তাহার ভালমন্দের প্রতি চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

এদিকে গোপাল ডাক্তার ছাড়া আর চিকিৎসক নাই, তিনি গরীবের ঘরে যাইবার সময় পান না, অথচ মহামারী প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে, ঔষধপথ্য ত দূরের কথা, মৃতদেহের সৎকার করাও দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল।

শুধু বৃন্দাবনের পাড়াটা তখনও নিরাপদ ছিল। রসিকের স্ত্রীর মৃত্যু ব্যতীত এই পাঁচ-সাতটা বাটীতে তখনও মৃত্যু প্রবেশ করে নাই।

বৃন্দাবনের পিতা নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার জল তখনও দুষ্ট হয় নাই, প্রতিবেশী গৃহস্থেরা এই পানীয় ব্যবহার করিয়াই সম্ভবতঃ এখনও মৃত্যু এড়াইয়াছিল।

কিন্তু, প্রতিদিন বৃন্দাবন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। ছেলের মুখের পানে চাহিলেই তাহার বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠে, কেবলই মনে হয়, অলক্ষ্যে অভেদ্য অন্তরায় তাহাদের পিতাপুত্রের মাঝখানে প্রতি মুহূর্তেই উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে! তাহার সে সাহস নাই, রোগ ও মৃত্যু শুনিলেই চমকাইয়া উঠে। ডাকিতে আসিলে যায় বটে, কিন্তু তাহার প্রতি পদক্ষেপ বিচারালয়ের অভিমুখে অপরাধীর চলনের মত দেখায়। শুধু তাহার চিরদিনের অভ্যাসই তাহাকে যেন টানিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায়। মৃতদেহ সৎকার করিয়া ঘরে ফিরিয়া, চরণকে কাছে ডাকিতে, তাহাকে স্পর্শ করিতে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। কেবলই মনে হয়,

অজ্ঞাতসারে কোন সংক্রামক বীজ বুঝি একমাত্র বংশধরের দেহে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। কি করিয়া যে তাহাকে বাহিরের সর্বপ্রকার সংস্রব হইতে, রোগ হইতে, মরণ হইতে আড়াল করিয়া রাখিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।

পাঠশালা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চরণের মুখের দিকে চাহিয়া, ইহাও তাহাকে ক্লিষ্ট করে নাই। কিছুদিন হইতে তাহার খাওয়া, পরা, শোওয়া সমস্তই নিজের হাতে লইয়াছিল, এ বিষয়ে মাকেও যেন সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এমনি সময়ে একদিন মায়ের মুখে সংবাদ পাইল, তাহাদের প্রতিবেশী তারিণী মুখুয্যের ছোটছেলে রোগে আক্রান্ত হইয়াছে; খবর শুনিয়া তাহার মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আর না বাবা! এবার চরণকে নিয়ে তুই বাইরে যা।

বৃন্দাবন ছলছল চক্ষে বলিল, মা! তুমিও চল।

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, আমার ঠাকুরঘর ফেলে রেখে!

পুরুতঠাকুরের ওপর ভার দিয়ে চল।

মা অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার ঠাকুরের ভার অপরে নেবে, আর আমি পালিয়ে যাব?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া বলিল, তা নয় মা, তোমার ভার তোমারই রইল, শুধু দু'দিন পরে ফিরে এসে তুলে নিয়ো।

মা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা হয় না বৃন্দাবন। আমার শাশুড়িঠাকরুন এ ভার আমাকে দিয়ে গেছেন, আমিও যদি কখন তেমন করে দিতে পারি, তবেই দেব, না হলে আমারই মাথায় থাক। কিন্তু, তোরা যা।

বৃন্দাবন উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, এই সময়ে কি করে তোমাকে একা রেখে যাব, মা? ধর যদি—মা একটু হাসিলেন। বলিলেন, সে ত সুসময় বাবা। তখন জানব, আমার কাজ শেষ হয়েচে, ঠাকুর তাঁর ভার অপরকে দিতে চান। তাই

হোক বৃন্দাবন, আমার আশীর্বাদ নিয়ে তোরা নির্ভয়ে যা, আমি আমার ঠাকুরঘর নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব।

জননীর অবিচলিত কণ্ঠস্বরে অন্যত্র পলাইবার আশা বৃন্দাবনের তিরোহিত হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত ভাবিয়া লইয়া সেও দৃঢ়স্বরে কহিল, তা হলে আমারও যাওয়া হবে না। তোমার ঠাকুর আছেন, আমারও মা আছেন। নিজের জন্য আমি এতটুকু ভয় পাইনি মা, শুধু চরণের মুখের দিকে চাইলেই আমি থাকতে পারিনে। কিন্তু যাওয়া যখন কোনমতেই হতে পারে না, তখন আজ থেকে তাকে ঠাকুরের পায়ে সঁপে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভয়ে থাকব। এখন থেকে আর তুমি আমার শুকনো মুখ দেখতে পাবে না মা।

তারিণী মুখুয্যের ছোটছেলে মরিয়াছে। পরদিন সকালবেলা বৃন্দাবন কি কাজে ঐ দিক দিয়া আসিতেছিল, দেখিতে পাইল, তাহাদের পুকুরের ঘাটের উপরেই একটি স্ত্রীলোক কতগুলি কাপড়চোপড় কাচিতেছে। কতক কাচা হইয়াছে, কতক তখনও বাকি আছে। বস্ত্রখণ্ডগুলির চেহারা দেখিয়াই বৃন্দাবন শিহরিয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, মড়ার কাপড়চোপড় কি বলে আপনি পুকুরে পরিষ্কার করচেন?

স্ত্রীলোকটি ঘোমটার ভিতর হইতে কি বলিল, তাহা বোঝা গেল না।

বৃন্দাবন বলিল, যতটা অন্যায় করেচেন, তার ত আর উপায় নেই, কিন্তু আর ধোবেন না—উঠে যান।

সে পরিষ্কৃত অপরিষ্কৃত বস্ত্রগুলি তুলিয়া লইয়া গেল।

বৃন্দাবন জলের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, দেখিল, তারিণী দ্রুতপদে এইদিকে আসিতেছে। একে পুত্রশোকে কাতর, তাহাতে এই অপমান, আসিয়াই পাগলের মত চোখমুখ করিয়া বলিল, তুমি নাকি আমার বাড়ির লোককে পুকুরে নাবতে দাওনি?

বৃন্দাবন কহিল তা নয়, আমি ময়লা কাপড় ধুতে মানা করেচি।

তারিণী চেঁচাইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় ধোবে? থাকব বাড়লে, ধুতে যাবো বন্দিবাটীতে? উচ্ছন্ন যাবি বৃন্দাবন—উচ্ছন্ন যাবি। ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হবি।

বৃন্দাবনের বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কিন্তু চেঁচামেচি করা, কলহ করা তাহার স্বভাব নয়; তাই আত্মসংবরণ করিয়া শান্তভাবে কহিল, আমি একা উচ্ছন্ন যাই, তত ক্ষতি নাই; কিন্তু আপনি সমস্ত পাড়াটা যে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন করেচেন। গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্চে, শুধু পাড়াটা ভাল আছে, তাও আপনি থাকতে দেবেন না?

ব্রাহ্মণ উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল, চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়চোপড় কাচে না ত কি তোমার মাথার ওপর কাচে বাপু?

বৃন্দাবন দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, এ পুকুর আমার। আপনি নিষেধ যদি না শোনেন, আপনার বাড়ির কোন লোককে আমি পুকুরে নাবতে দেব না।

নাবতে দিবিনে ত, আমরা যাব কোথায় বলে দে?

বৃন্দাবন কহিল, এখান থেকে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারেন। কাপড়চোপড় ধুতে হলে মাঠের ধারের ডোবাতে গিয়ে ধুতে হবে।

তারিণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটলোক হয়ে তোর এতবড় মুখ? তুই বলিস মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে? একলা আমার বাড়িতেই বিপদ ঢোকেনি রে, তোর বাড়িতেও ঢুকবে।

বৃন্দাবন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, আমি মেয়েদের যেতে বলিনি। আপনার ঘরে যখন দাসী-চাকর নেই, তখন মানুষ হন ত নিজে গিয়ে ধুয়ে আনুন।

আপনি এখন শোকে কাতর, আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়—কিন্তু হাজার অভিসম্পাত দিলেও আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না। বলিয়া আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে ঘোষাল মহাশয় আসিয়া সদরে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। ইনি তারিণীর আত্মীয়, বৃন্দাবন বাহিরে আসিতেই বলিলেন, হাঁ, বাপু বৃন্দাবন, তোমাকে সবাই সৎ ছেলে বলেই জানে, একি ব্যবহার তোমার? ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে মারা যাচ্চে, তার ওপর তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েচ নাকি?

বৃন্দাবন কহিল, ময়লা কাপড় ধোয়া বন্ধ করেচি, জল তোলা বন্ধ করিনি।

ভাল করনি বাপু। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, তোমার মান্য রেখে ঘাটের ওপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, এই পুকুরটি মাত্র সমস্ত গ্রামের সম্বল, কিছুতেই আমি এমন দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।

বিজ্ঞ ঘোষাল মহাশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, এ তোমার অন্যায় জিদ বৃন্দাবন। শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা-করা পুস্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না। দু'পাতা ইংরিজি পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চলবে কেন বাপু?

বৃন্দাবন এক কথা একশবার বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিরক্ত হইয়া বলিল, শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনাদের মন-গড়া শাস্ত্র মানিনে। যা বলেছি তাই হবে, আমি ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ ম'লে ও-সব পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু আপনারা যখন সে মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না, তখন মাঠের ডোবা থেকে পরিস্কার করে আনুন, আমার পুকুরে ও-সব চলবে না, বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

শাস্ত্রজ্ঞানী ঘোষাল মহাশয় বৃন্দাবনের সর্বনাশ কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু বৃন্দাবন ঠিক জানিত, এইখানে ইহার শেষ নয়, তাই সে একটা লোককে পুষ্করিণীর জল পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। লোকটা সমস্তদিনের পর রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া সংবাদ দিল, পুকুরের জলে কাপড় কাচা হইতেছে এবং তারিণী মুখুয্যে কিছুতেই নিষেধ শুনিতেছেন না। বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া

দেখিল, তারিণীর বিধবা কন্যা বালিশের অড়, বিছানার চাদর, ছোট-বড় অনেকগুলি বস্ত্রখন্ড জলে কাচিয়া জলের উপরেই সেগুলি নিঙড়াইয়া লইতেছে, তারিণী নিজে দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালেই বৃন্দাবন জননীর নির্দেশমত চরণকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোর মায়ের কাছে যাবি রে চরণ?

চরণ নাচিয়া উঠিল—যাব বাবা।

বৃন্দাবন মনে মনে একটু আঘাত পাইয়া বলিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোকে অনেকদিন থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাকতে?

চরণ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, পারব।

বস্তুতঃ এ-দিকের সূক্ষ্ম বাঁধাধরা আঁটাআঁটির মধ্যে তাহার শিশুপ্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বাহিরে ছুটাছুটি করিতে পায় না, পাঠশালা বন্ধ, সঙ্গী-সাথীদের মুখ দেখিতে পর্যন্ত পায় না, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, চারিদিকেই কিরকম একটা ভীতসন্ত্রস্ত ভাব, ভাল করিয়া কোন কথা বুঝিতে না পারিলেও ভিতরে ভিতরে সে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ও-দিকে মায়ের অগাধ স্নেহ, অবাধ স্বাধীনতা—স্নান, আহার, খেলা কিছুতে নিষেধ নাই, হাজার দোষ করিলেও হাসিমুখে সস্নেহের অনুযোগ ভিন্ন, কাহারও ভ্রূকুটি সহিতে হয় না—সে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল।

তবে যা, বলিয়া বৃন্দাবন নিজের হাতে একটি ছোট টিনের বাক্স জামায়-কাপড়ে পরিপূর্ণ করিয়া এবং তাহাতে কিছু টাকা রাখিয়া দিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল এবং সজল-চক্ষে ছেলের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে তার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দুঃখের ভিতরেও একটা সুগভীর স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। যে ভৃত্য সঙ্গে গেল, পুত্রের উপর অনুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য বারংবার উপদেশ করিল এবং প্রত্যহ না হোক, একদিন অন্তরও সংবাদ জানাইয়া যাইবার জন্য

আদেশ দিল। মনে মনে বলিল, আর কখন যদি দেখতেও না পাই, সেও ভাল, কিন্তু এ বিপদের মধ্যে আর রাখিতে পারি না।

গাড়ি যতক্ষণ দেখা গেল, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া হঠাৎ সেদিনের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার ভয় হইল, পাছে কুসুম রাগ করে।

মনে মনে বলিল, না, কাজটা ঠিক হল না। অত বড় একজিদী রাগী মানুষকে ভরসা হয় না। নিজে সঙ্গে না গেলে হয়ত উলটো বুঝে একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠবে। একখানা চাদর কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া অবিলম্বে গাড়ির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ছেলের পাশে উঠিয়া বসিল।

কুঞ্জনাথের বাটীর সুমুখে আসিয়া, বাহির-বাটীর চেহারা দেখিয়া বৃন্দাবন আশ্চর্য হইয়া গেল। চারিদিক অপরিচ্ছন্ন—যেন বহুদিন এখানে কেহ বাস করে নাই। দোর খোলা ছিল, ছেলেকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াও দেখিল—সেই ভাব।

সাড়া পাইয়া কুসুম ঘর হইতে 'দাদা' বলিয়া বাহিরে আসিয়াই অকস্মাৎ ইহাদিগকে দেখিয়া ঈর্ষায় অভিমানে জ্বলিয়া উঠিয়া, চক্ষের নিমিষে পিছাইয়া ঘরে ঢুকিল। চরণ পূর্বের মত মহোল্লাসে চেঁচামিচি করিয়া ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিল। কুসুম তাহাকে কোলে লইয়া মাথায় রীতিমত আঁচল টানিয়া দিয়া মিনিট-পাঁচেক পরে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, কুঞ্জদা কৈ?

কি জানি, কোথায় বেড়াতে গেছেন।

বৃন্দাবন কহিল, দেখে মনে হয় এ যেন পোড়ো-বাড়ি। এতদিন তোমরা কি এখানে ছিলে না?

না।

কোথায় ছিলে?

মাসখানেক পূর্বে কুসুম দাদার শাশুড়ির সঙ্গে পশ্চিমে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, কাল সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে কথা না বলিয়া তাচ্ছিল্যভাবে জবাব দিল, এখানে সেখানে নানা জায়গায় ছিলুম।

অন্যবারে কুসুম সর্বাগ্রে বসিবার আসন পাতিয়া দিয়াছে, এবার তাহা দিল না দেখিয়া বৃন্দাবন নিজেই বলিল, দাঁড়িয়ে রয়েচি, একটা বসবার জায়গা দাও।

কুসুম তেমনি অবজ্ঞাভরে বলিল, কি জানি, কোথায় আসন-টাসন আছে, বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক পা নড়িল না।

বৃন্দাবন প্রস্তুত হইয়া আসিলেও এতবড় অবহেলা তাহাকে সজোরে আঘাত করিল। কিন্তু সেদিনের উত্তেজনাবশতঃ কলহ করিয়া ফেলার হীনতা তাহার মনে ছিল না, তাই সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া, নম্রস্বরে বলিল, আমি বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। যেজন্য এসেছি, বলি।

আমাদের ওখানে ভারী ব্যারাম হচ্চে, তাই চরণকে তোমার কাছে রেখে যাব।

কুসুম এতদিন এখানে ছিল না বলিয়াই ব্যারাম-স্যারামের অর্থ বুঝিল না, তীব্র অভিমানে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল, ওঃ—তাই দয়া করে নিয়ে এসেচ? কিন্তু অসুখ-বিসুখ নেই কোন্ দেশে? আমিই বা পরের ছেলের দায় ঘাড়ে করব কি সাহসে?

বৃন্দাবন শান্তভাবে কহিল, আমি যে সাহসে করি, ঠিক সেই সাহসে। তাছাড়া তোমাকেই বোধ করি, ও সবচেয়ে ভালবাসে।

কুসুম কি একটা বলিতে যাইতেছিল, চরণ হাত দিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, মা, বাবা বলেচে, আমি তোমার কাছে থাকব–নাইতে যাবে না, মা?

কুসুম প্রত্যুত্তরে বৃন্দাবনকে শুনাইয়া কহিল, আমার কাছে তোমার থেকে কাজ নেই চরণ, তোমার নতুন মা এলে তার কাছে থেকো।

বৃন্দাবন অতিশয় ম্লান একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাও শুনেচ। আচ্ছা, বলচি তা হলে। মা একা আর পেরে ওঠেন না বলেই একবার ও-কথা উঠেছিল, কিন্তু তখনি থেমে গেছে।

থামল কেন?

তার বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু সে-কথায় আর কাজ নেই।—চরণ, আয় রে, আমরা যাই—বেলা বাড়চে।

চরণ অনুনয় করিয়া কহিল, বাবা, কাল যাব।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া রহিল। কুসুমও কথা না কহিয়া চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। মিনিট-দুই পরে বৃন্দাবন গম্ভীরস্বরে ডাক দিয়া বলিল, আর দেরি করিস্ নে রে, আয় বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

চরণ বড় আদরের সন্তান হইলেও গুরুজনদের আদেশ পালন করিতে শিখিয়াছিল, তথাপি সে মায়ের মুখের দিকে সতৃষ্ণ চোখ দুটি তুলিয়া শেষে ক্ষুব্ধমুখে নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

গাড়োয়ান গরু দুটাকে জল খাওয়াইয়া আনিতে গিয়াছিল, পিতাপুত্র অপেক্ষা করিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। এইবার কুসুম সরিয়া আসিয়া সদর দরজার ফাঁক দিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার সে লাবণ্য নাই, চোখমুখের ভাব অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডুর; হঠাৎ সে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া আড়ালে থাকিয়াই ডাকিল, একবার শোনো।

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া কহিল, কি?

তোমার কি এর মধ্যে অসুখ করেছিল?

না।

তবে, এমন কেন?

তা ত বলতে পারিনে। বোধ করি ভাবনায় চিন্তায় শুকনো দেখাচ্চে।

ভাবনা-চিন্তা। স্বামীর শীর্ণমুখের পানে চাহিয়া তাহার জ্বালাটা নরম হইয়া আসিয়াছিল, শেষ কথায় পুর্নবার জ্বলিয়া উঠিল। শেষ কথায় পুনর্বার জ্বলিয়া উঠিল। শ্লেষ করিয়া কহিল, তোমার ত ষোলআনাই সুখের! ভাবনা-

চিন্তা কি শুনি?

বৃন্দাবন ইহার জবাব দিল না। গাড়ি প্রস্তুত হইলে, চরণ উঠিতে গেলে বৃন্দাবন কহিল, তোর মাকে প্রণাম করে এলিনে রে?

সে নামিয়া দ্বারের বাহিরে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিল, কুসুম ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলে ছুটিয়া পালাইয়া গেল। সব কথা না বুঝিলেও এ কথাটা সে বুঝিয়াছিল, মাতা তাহাকে আজ আদর করে নাই, এবং সে থাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে রাখে নাই।

বৃন্দাবন আরও একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিল, কে জানে, যদি আর কখন না বলতে পাই, তাই আজই কথাটা বলে যাই! আজ রাগের মাথায় তোমার চরণকে তুমি ঠাঁই দিলে না, কিন্তু, আমার অবর্তমানে দিয়ো।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া উঠিল—ও-সব আমি শুনতে চাইনে।

তবু শোনো। আজ তোমার হাতেই তাকে দিতে এসেছিলুম।

আমাকে তোমার বিশ্বাস কি?

বৃন্দাবনের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, বলিল, তবু সেই রাগের কথা! কুসুম, শুনি তুমি অনেক শিখেছ, কিন্তু মেয়েমানুয হয়ে ক্ষমা করতে শেখাই যে সবচেয়ে বড়-শেখা এটা কেন শেখোনি! কিন্তু তুমি চরণের মা, এই আমার বিশ্বাস। ছেলেকে মা-বাপের হাতে দিয়ে বিশ্বাস না হলে কার হাতে হয় বল?

কুসুম হঠাৎ এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

গরু দুটা বাড়ি ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চরণ ডাকিল, বাবা, এসো না!

কুসুম কিছু বলিবার পূর্বেই বৃন্দাবন 'যাই' বলিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল।

কুসুম সেইখানে বসিয়া পড়িয়া মহা অভিমান-ভরে তাহার পরলোকগতা জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, মা হইয়া এ কি অসহ্য শত্রুতা সন্তানের প্রতি সাধিয়া গিয়াছ মা! যদি, যথার্থই আমার অজ্ঞানে কলঙ্কে আমাকে ডুবাইয়া গিয়াছ, যদি সত্যিই নিজের ঘৃণিত দর্পের পায়ে আমাকে বলি দিয়াছ, তবে সে-কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাও নাই কেন? কার ভয়ে সমস্ত চিহ্ন এমন করিয়া মুছিয়া দিয়া গেলে? আমার অন্তর্যামী যাহাদিগকে স্বামী-পুত্র বলিয়া চিনিয়াছে, সমস্ত জগতের সুমুখে সেকথা সপ্রমাণ করিবার রেখামাত্র পথ অবশিষ্ট রাখ নাই কেন? আজ তাহা হইলে কে আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিত, কোন্ নির্লজ্জ স্বামী, স্ত্রীকে অনাথিনীর মত নিজের আশ্রয়ে প্রবেশ করিবার উপদেশ দিতে সাহস করিত?

কিংবা সত্যই যদি আমি বিধবা, তাই বা নিঃসংশয়ে জানিতে পাই না কেন? তখন কার সাধ্য বিধবার সম্মুখে রূপের লোভে বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিতে সাহস করিত?

একস্থানে একভাবে বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিয়া কুসুম আকাশের পানে চোখ তুলিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, ভগবান, আমার যা হোক একটা উপায় করে দাও। হয় মাথা তুলিয়া সগর্বে স্বামীর ঘরে যাইতে দাও, না হয় ছেলেবেলার সেই নিশ্চিত নির্বিঘ্ন দিনগুলি ফিরাইয়া দাও, আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্বামী আবার বিবাহ করিতেছেন, সেদিন দাদার মুখে এই সংবাদ শুনিবার পরে, কি করি, কোথায় পালাই, এমনি যখন তাহার মানসিক অবস্থা, সেই সময়েই দাদার শাশুড়ির সঙ্গে তীর্থে যাইবার প্রস্তাবে সে বিনাবাক্যব্যয়ে যাইতে সম্মত হইয়াছিল। কুঞ্জর শাশুড়ি কুসুমকে নিতান্তই দাসীর মত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সেই মত ব্যবহারও করিয়াছিলেন। কিন্তু এসব ছোটখাটো বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সামর্থ্য কুসুমের ছিল না, নলডাঙ্গায় ফিরিয়া যখন সে বাড়ি আসিতে চাইল, এবং তিনি সাপের মত গর্জন করিয়া বলিলেন, ক্ষ্যাপার মত কথা বলো না বাছা। আমাদের বড়লোকদের শত্রুর পদে পদে—তুমি সোমত্ত মেয়ে, সেখানে একলা পড়ে থাকলে, আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পারব না। তখনও কুসুম প্রতিবাদ করে নাই।

তিনি ক্ষণেক পরে কহিলেন, ইচ্ছে হয়, দাদার সঙ্গে যাও, ঘরদোর দেখে দাদার সঙ্গেই ফিরে এসো। একলা তোমার কিছুতেই থাকা হবে না, তা বলে দিচ্ছি।

কুসুম তাহাতেই রাজি হইয়া কাল সন্ধ্যায় ঘরদোর দেখিতে আসিয়াছিল।

আজ চরণ প্রভৃতি চলিয়া যাইবার ঘণ্টা-দুই পরে কুঞ্জনাথ জমিদারি চালে সারা গ্রামটা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল, স্নানাহার করিয়া নিদ্রা দিল এবং বেলা পড়িলে বোনকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার আয়োজন করিল। কুসুম ঘরদোরে চাবি দিয়া নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়া বসিল। সে জানিত, দাদা ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাই সকালের কোন কথা প্রকাশ করিল না।

কুঞ্জর স্ত্রীর নাম ব্রজেশ্বরী। সে যেমন মুখরা, তেমনি কলহপটু। বয়স এখনও পনর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু তাহার কথার বাঁধুনি ও বিষের জ্বলনে তাহার মাকেও হার মানিয়া চোখের জল ফেলিতে হইত।

এই ব্রজেশ্বরী কুসুমকে কি জানি কেন, চোখের দেখামাত্রই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, মা তাহাতে খুশি হন নাই, এবং মেয়ের চোখের আড়ালে টিপিয়া টিপিয়া তাহাকে যা-তা বলিতে লাগিলেন।

বাড়ির সম্মুখেই পুষ্করিণী, তিন-চার দিন পরে, একদিন সকালে সে কতকগুলো বাসন লইয়া ধুইয়া আনিতে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী ঘর হইতে বাহির হইয়াই সুতীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, হাঁ ঠাকুরঝি, মা তোমাকে ক'টাকা মাইনে দেবে বলে এনেচে গা?

মা অদূরে ভাঁড়ারের সুমুখে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, মেয়ের তীব্র শ্লেষাত্মক প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন, এ তোর কি রকম কথার ছিরি লা? মানুষ আপনার জনকে কি মাইনে দিয়ে ঘরে আনে?

মেয়ে উত্তর দিল, আপনার জন আমার, তোমার এ কে যে, দুঃখী মানুষকে দিয়ে দাসীবৃত্তি করিয়ে নেবে, মাইনে দেবে না?

প্রত্যুত্তরে মা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া কুসুমের হাত হইতে বাসনগুলো একটানে ছিনাইয়া লইয়া নিজেই পুকুরে চলিয়া গেলেন।

কুসুম হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, ব্রজেশ্বরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া তা যাক বলিয়াই ঘরে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুই-তিন দিন তিনি কুসুমকে লক্ষ্য করিয়া বেশ রাগ-ঝাল করিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তাঁহার ব্যবহারের পরিবর্তন দেখিয়া ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য হইল।

কাল রাত্রে শরীর ভাল নাই বলিয়া কুসুম খায় নাই, আজ সকালেই গৃহিণী স্নানাহ্নিক করিয়া খাইয়া লইবার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, মা ভোল ফেরালেন কেন, তাই ভাবচি ঠাকুরঝি!

কুসুম চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু মেয়ে মাকে বেশ চিনিত, তাই দু'দিনেই এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের কারণ সন্দেহ করিয়া মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল।

গোবর্ধন বলিয়া গৃহিণীর এক বোনপো ছিল, সে অপরিমিত তাড়ি ও গাঁজা-গুলি খাইয়া চেহারাটা এমন করিয়া রাখিয়াছিল যে, বয়স পঁয়ত্রিশ কি পঁয়ষট্টি, তাহা ধরিবার জো ছিল না। কেহ মেয়ে দেয় নাই বলিয়া এখনো অবিবাহিত। বাড়ি ও-পাড়ায়, পূর্বে কদাচিৎ দেখা মিলিত, কিন্তু সম্প্রতি কোন্ অজ্ঞাত কারণে মাসীমায়ের প্রতি তাহার ভক্তি ভালবাসা এতই বড় হইয়া উঠিল যে প্রত্যহ যখন তখন 'মাসীমা' বলিয়া হাজির হইয়া, তাহার ঘরে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা ও আদেশ-উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্নে ব্রজেশ্বরী কুসুমকে লইয়া পুকুরে গা ধুইতে গিয়াছিল। জলে নামিয়া, ঘাটের অদূরে একটা ঘন কামিনী-ঝাড়ের প্রতি হঠাৎ নজর পড়ায় দেখিল, তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া গোবর্ধন একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, তখন আর কিছু না বলিয়া, কোনমতে কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, সে উঠানের উপর দাঁড়াইয়া মাসীর সহিত কথা কহিতেছে। কুসুম আকণ্ঠ ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া ঘরে চলিয়া গেলে, ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা গোবর্ধন দাদা, আগে কোনকালে তোমাকে ত দেখতে পেতাম না, আজকাল হঠাৎ এমন সদয় হয়ে উঠেচ কেন বল ত? বাড়ির ভেতরে আসা-যাওয়াটা একটু কম করে ফ্যালো।

গোবর্ধন জানিত না সে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু এই প্রশ্নের ভাবে উৎকণ্ঠায় শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—জবাব দিতে পারিল না।

কিন্তু মা অগ্নিমূর্তি হইয়া চোখ রাঙ্গা করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, আগে ওর ইচ্ছে হয়নি, তাই আসেনি, এখন ইচ্ছে হয়েচে আসচে। তোর কি?

মেয়ে রাগ করিল না, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, এই ইচ্ছেটাই আমি পছন্দ করিনে। আমার নিজের জন্যও তত বলিনে মা, কিন্তু আমার ননদ রয়েচে, পরের মেয়ে, তা ত মনে রাখতে হবে।

মা সপ্তমে চড়িয়া উত্তর করিলেন, পরের মেয়ের জন্য কি আমার আপনার বোনপো ভাইপোরা পর হয়ে যাবে, না বাড়ি ঢুকবে না? তা ছাড়া এই পরের মেয়েটি কি পর্দার বিবি, না কারুর সামনে বার হন না? ওলো, ও যেমন করে বার হতে জানে, তা দেখলে আমাদের বুড়ো মাগীদের পর্যন্ত লজ্জা হয়।

ব্রজেশ্বরী বুঝিল, মা কি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাই সে থামিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, এই কুসুমেরই কত কথা, কত ভাবে, কত ছাঁদে, সে দু'দিন আগে মায়ের সহিত আলোচনা করিয়াছে। কিন্তু তখন আলাদা কথা ছিল, এখন সম্পূর্ণ আলাদা কথা দাঁড়াইয়াছে। তখন কুসুমকে সে ভালবাসে নাই, এখন বাসিয়াছে। এবং এধরনের ভালবাসা ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতীত দেওয়াও যায় না, পাওয়াও যায় না।

ব্রজেশ্বরী যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া গোবর্ধনের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, গোবর্ধন দাদা, ভারী লজ্জার কথা ভাই, মুখ ফুটে বলতে পারলুম না, কিন্তু আমি দেখেচি। দাদার মত আসতে পার ত এসো, না হলে তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে—সে দুঃখ মাও ঠেকাতে পারবে না, তা বলে দিচ্চি। বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মা কহিলেন, কি হয়েচে রে গোবর্ধন?

গোবর্ধন মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল, তোমার দিব্যি মাসী, আমি জানিনে—কোন্ শালা ঝোপের ভিতর—মাইরি বলচি—একটা দাঁতন ভাঙতে—জিজ্ঞেস করবে চল ময়রাদের দোকানে—আসুক ও আমার সঙ্গে ও-পাড়ায়, ভজিয়ে দিচ্চি—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গোবর্ধন সরিয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বরী কাপড় ছাড়িয়া কুসুমের ঘরে গিয়া দেখিল, তখনও সে ভিজা কাপড়ে স্তব্ধ হইয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহির দিকে চাহিয়া আছে। পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন বৌ, আমার কথায় তুমি কথা কইতে গেলে? আমাকে কি তুমি এখানেও টিকতে দেবে না?

আগে কাপড় ছাড়, তারপর বলচি, বলিয়া সে জোর করিয়া তাহার আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া দিয়া কহিল, অন্যায় আমি কোনমতেই সইতে পারিনে ঠাকুরঝি, তা তোমার জন্যই হোক, আর আমার জন্যই হোক। ও হতভাগাকে আমি বাড়ি ঢুকতে দেব না—ওর মতলব আমি টের পেয়েছি।

জননীর কথাটা সে লজ্জায় উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কুসুম কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মতলব যার যাই থাক বৌদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার কথা নিয়ে কথা কয়ে আর আমাকে বিপদে ফেলো না।

কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে বিপদ হবে কেন?

কুসুম প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, হবেই। চোখে দেখচি হবে, কপালে সজোর আঘাত করিয়া কহিল, এই হতভাগা কপালকে যেখানে নিয়ে যাব, সেইখানেই বিপদ সঙ্গে সঙ্গে যাবে। বোধ করি, স্বয়ং ভগবানও আমাকে রক্ষা করতে পারেন না! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বোধ করি নিতান্ত মিথ্যে বলনি। রাগ করো না ভাই, কিন্তু শুধু কপালের দোষ দিলে হবে কেন? তোমার নিজেরও দোষ কম নয় ঠাকুরঝি!

কুসুম তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার নিজের দোষ কি? আমার ছেলেবেলার ঘটনা সব শুনেচ ত?

শুনেচি। কিন্তু সে আগাগোড়া মিথ্যে। সমস্ত জেনে শুনে এ'স্ত্রী মানুষ তুমি—সিঁদুর পর না, নোয়া হাতে রাখ না, স্বামীর ঘর কর না, এ কপালের দোষ,

না তোমার নিজের দোষ ভাই? তখন না হয় জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না, এখন হয়েচে ত? তুমি বল, কোন্ সধবা কবে বিধবার বেশে থাকে?

সমস্তই জানি বৌ, কিন্তু আমি সিঁদুর-নোয়া পরে থাকলেই ত লোকে শুনবে না। কে আমার স্বামী? কে তার সাক্ষী? তিনিই বা আমাকে শুধু শুধু ঘরে নেবেন কেন?

ব্রজেশ্বরী বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়া বলিল, সে কি কথা ঠাকুরঝি? এর চেয়ে বেশি প্রমাণ কবে কোন্ জিনিসের হয়ে থাকে? তুমি কি কিছুই শোননি, ঐ কথা নিয়ে কি কান্ড নন্দজ্যাঠার সঙ্গে এই বাড়িতেই হয়ে গেল? একটুখানি চুপ করিয়া পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, কেন, তোমার দাদা ত সমস্ত জানেন, তিনি বলেন নি? আমি মনে করেচি, তুমি সমস্ত জেনেশুনেই এখানে এসেচ, তাই পাছে রাগ কর, মনে দুঃখ পাও, সেইজন্যে কোন কথা বলিনি, চুপ করেই আছি। বরং, তুমি এসেচ বলে প্রথম দিন তোমার উপর আমার রাগ পর্যন্ত হয়েছিল।

কুসুম উদ্বেগে অধীর হইয়া বলিল, আমি কিছু শুনিনি বৌ, কি হয়েছিল বল।

ব্রজেশ্বরী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বেশ! যেমন ভাই, তেমনি বোন। ঠাকুরজামাইয়ের সঙ্গে নন্দজ্যাঠার মেয়ের যখন সম্বন্ধ হয়, তখন তোমরা পশ্চিমে ছিলে, তখন তোমার দাদাই অত হাঙ্গামা বাধালে, আর শেষে সে-ই চুপ করে আছে! আমার শাশুড়ির কথা, তোমাদের কথা, ওদের কথা, সমস্তই উঠে—তখন নন্দজ্যাঠা অস্বীকার করেন, পাছে তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়।

তারপরে ঠাকুরবাড়ির বড়-বাবাজীকে ডেকে আনা হয়, তিনি মীমাংসা করে দেন, সমস্ত মিথ্যে। কারণ একে ত তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে আমাদের সমাজে এ-সকল কাজ হতেই পারে না, তা ছাড়া তিনি নন্দজ্যাঠাকে হুকুম দেন, যে এ কাজ করিয়েছিল তাকে হাজির করিয়ে দিতে। তখনই তাঁকে স্বীকার করতে হয় কণ্ঠীবদলের কথা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু হয়নি।

কুসুম আশঙ্কায় নিশ্বাস রোধ করিয়া বলিয়া উঠিল, হয়নি? বৌ, আমি মনে মনে জানতুম। কিন্তু আমার কথাই বা এত উঠল কেন?

ব্রজেশ্বরী হাসিয়া বলিল, তোমার দাদার একটুখানি বাইয়ের ছিট আছে কিনা তাই। অপর কেউ হয়ত চক্ষুলজ্জাতেও এত গণ্ডগোল করতে চাইত না, কিন্তু ওঁর ত সে বালাই নেই, তাই চতুর্দিকে তোলপাড় করতে লাগলেন, আমার বোনের যখন কোন দোষ নেই, মা যখন সত্যিই তার কণ্ঠীবদল দেননি, তখন কেন ঠাকুরজামাই তাকে নিয়ে ঘর করবে না, কেন আবার বিয়ে করবে, আর কেনই বা নন্দজ্যাঠা তাকে মেয়ে দেবে!

কুসুম লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া বলিল, ছি ছি, তার পরে?

ব্রজেশ্বরী কহিল, তার পরে আর বেশি কিছু নেই। আমার শাশুড়িঠাকরুন আর নন্দজ্যাঠাইমা এক গাঁয়ের মেয়ে, রাগে-দুঃখে, লজ্জায়-অভিমানে তোমাকে নিয়ে এইখানেই আসেন, তাঁর ছেলের সঙ্গেই কথা হয়—কিন্তু হতে পায়নি। আচ্ছা ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই নিজেও ত সব কথা শুনে গেছেন, তিনিও কি কোন ছলে জানান নি? আগে শুনেছিলুম, তোমার জন্যে তিনি নাকি—

কুসুম মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, বৌ, সেদিন হয়ত তিনি তাই বলতেই এসেছিলেন।

ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দিন? সম্প্রতি এসেছিলেন?

হাঁ, আমরা যেদিন এখানে আসি সেদিন সকালে।

তার পরে?

আমার দুর্ব্যবহারে না বলেই ফিরে যান।

ব্রজেশ্বরী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, কি করেছিলে? কুঞ্জে ঢুকতে দাওনি, না কথা কওনি?

কুসুম জবাব দিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

ব্রজেশ্বরীও আর কোন প্রশ্ন করিল না। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছিল, চারিদিকে শাঁখের শব্দে সে চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি একটু বসো ভাই, আমি সন্ধ্যা দিয়ে একটা প্রদীপ জ্বেলে আনি, বলিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুসুম সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। প্রদীপ যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া কুসুমের পাশে আসিয়া বসিল এবং তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, সত্যই কাজটা ভাল করনি দিদি। অবশ্য কি করেছিলে, তা আমি জানিনে, কিন্তু মনে যখন জানো তিনি কে, আর তুমি কে, তখন তাঁর অনুমতি ভিন্ন তোমার কোথাও যাওয়া উচিত হয়নি।

কুসুম মুখ তুলিল না, চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী কহিল, তোমাদেরই কথা তোমারই মুখ থেকে যতদূর শুনেচি, আমার তেমন অবস্থা হলে, পায়ে হেঁটে যাওয়া কি ঠাকুরঝি, যদি হুকুম দিতেন, সারা পথ নাকখত দিয়ে যেতে হবে, আমি তাই যেতুম!

কুসুম পূর্ব্ববৎ থাকিয়াই এবার অস্ফুটে বলিল, বৌ, মুখে বলা যায় বটে, কিন্তু কাজে করা শক্ত।

কিছু না। গেলে স্বামী পাবো, ছেলে পাবো, তাঁর ভাত খেতে পাবো, এত পাওয়ার কাছে মেয়েমানুষের শক্ত কাজ কি দিদি? তাও যদি না পাই, তবু ফিরে আসতুম না—তাড়িয়ে দিলেও না। গায়ে ত আর হাত দিতে পারতেন না, তবে আর ভয়টা কি? বড়জোর বলতেন, তুমি যাও; আমিও বলতুম, তুমি যাও—জোর করে থাকলে কি করতেন তিনি?

তাহার কথা শুনিয়া এত দুঃখেও কুসুম হাসিয়া ফেলিল।

ব্রজেশ্বরী কিন্তু এ হাসিতে যোগ দিল না—সে নিজের মনের কথাই বলিতেছিল, হাসাইবার জন্য, সান্ত্বনা দিবার জন্য বলে নাই। অধিকতর গম্ভীর

হইয়া কহিল, সত্যি বলচি ঠাকুরঝি, কারো মানা শুনো না—যাও তাঁর কাছে। এমন বিপদের দিনে স্বামী-পুত্রকে একা ফেলে রেখো না।

ব্রজেশ্বরীর এই আকস্মিক কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে কুসুম সব ভুলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, বিপদের দিন কেন?

ব্রজেশ্বরী বলিল, বিপদের দিন বৈ কি! অবশ্য, তাঁরা ভাল আছেন, কিন্তু বাড়লে সেই যে ওলাউঠা শুরু হয়েছিল, তোমার দাদা এখনি বললেন, এখন নাকি ভয়ানক বেড়েছে—প্রত্যহ দশজন, বারজন করে মারা পড়চে—ছি ছি, ওকি কর—পায়ে হাত দিয়ো না ঠাকুরঝি।

বৌদি, আমার চরণকে তিনি দিতে এসেছিলেন, আমি নিইনি—আমি কিছু শুনিনি বৌদি——কুসুম তাহার দুই-পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল,

ব্রজেশ্বরী বাধা দিয়া বলিল, বেশ, এখন শুনলে ত! এখন গিয়ে তাকে নাও গে!

কি করে যাবো?

ব্রজেশ্বরী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দোর ঠেলিয়া চৌকাঠের ও-দিকে মা দাঁড়াইয়া আছেন। চোখাচোখি হইতেই তীব্র শ্লেষের সহিত বলিলেন, ঠাকুরঝি-ঠাকরুনকে কি পরামর্শ দেওয়া হচ্চে শুনি?

ব্রজেশ্বরী স্বাভাবিকস্বরে কহিল, বেশ ত মা, ভেতরে এসো বলচি। তোমার কিন্তু কোন ভয়ের কারণ নেই মা, আপনার লোককে কেউ খারাপ মতলব দেয় না, আমিও দিচ্চিনে।

মা বহুক্ষণ হইতেই অন্তরে পুড়িয়া মরিতেছিলেন, জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তার মানে আমি লোকজনকে কুমতলব দিয়ে থাকি, না? তখনি জানি, ও কালামুখী যখন ঘরে ঢুকেচে, তখন এ বাড়িও ছারখার করবে। সাধে কি কুঞ্জনাথ ওকে দুটি চক্ষে দেখতে পারে না, এই স্বভাব-রীতির গুণে!

মেয়েও তেমনি শক্ত কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুসুমের হাতের চিমটি খাইয়া থামিয়া বলিল, সেইজন্যেই কালামুখীকে বলছিলুম, যা শ্বশুরঘর কর্ গে যা, থাকিস নে এখানে।

শ্বশুরবাড়ির নামে মা তাম্বুলরঞ্জিত অধর প্রসারিত ও তিলকসেবিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, বলি কোন্ শ্বশুরঘরে ঠাকুরঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস লো? নন্দ বোষ্ট—

এবার ব্রজেশ্বরী ধমক দিয়া উঠিল—সমস্ত জেনে ন্যাকা সেজে খামকা মানুষকে অপমান করো না।

শ্বশুরঘর মেয়েমানুষের দশ-বিশটা থাকে না যে, আজ নন্দ বোষ্টমের নাম করবে, কাল তোমার গোবর্ধনের বাপের নাম করবে, আর তাই চুপ করে শুনতে হবে।

মেয়ের নিষ্ঠুর স্পষ্ট ইঙ্গিতে মা বারুদের মত ফাটিয়া পড়িয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, হতভাগী, মেয়ে হয়ে তুই মায়ের নামে এতবড় অপবাদ দিস্!

মেয়ে বলিল, অপবাদ হলেও বাঁচতুম মা, এ যে সত্যি কথা। মাইরি বলচি মা, তোমাদের মত দু-একটি বোষ্টম মেয়েদের গুণে আমার বরং হাড়ী মুচি বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বোষ্টম বলতে মাথা কাটা যায়। থাক, চেঁচামেচি করো না, যদি অপবাদ দিয়েচি বলেই তোমার দু:খ হয়ে থাকে, ঠাকুরঝিকে বাড়লে পাঠিয়ে, তার পরে তোমার যা মুখে আসে, তাই বলে আমাকে গাল দিয়ো; তোমার দিব্যি করে বলছি মা, কথাটি কব না।

মেয়ের সুতীক্ষ্ণ শরের মুখে মা বুঝিলেন, যুদ্ধ এভাবে আর অধিকদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারই পরাজয় হইবে, কণ্ঠস্বর নরম করিয়া বলিলেন, সেখানে পাঠিয়ে দিলেই বা তারা ঘরে নেবে কেন? তোর চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি ব্রজেশ্বরী, আর তারা ওর কেউ নয়, বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের কোন সম্পর্ক নেই।

মিথ্যে আশা দিয়ে ওকে তুই নাচিয়ে বেড়াস নে, বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তর না শুনিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুসুম শুষ্ক পাণ্ডুর মুখখানি উঁচু করিতেই ব্রজেশ্বরী জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, মিথ্যে কথা বোন, মিথ্যে কথা। মা জেনেশুনে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলে গেলেন, আমি মেয়ে হয়ে তোমার কাছে স্বীকার করচি—আচ্ছা, এখনি আসচি আমি, বলিয়া কি ভাবিয়া ব্রজেশ্বরী দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অবস্থা ভাল হইলে যে বুদ্ধিও ভাল হয়, কুঞ্জনাথ তাহা সপ্রমাণ করিল। পত্নী ও ভগিনীর সংযুক্ত অনুরোধ ও আবেদন তাহাকে কর্তব্যবিচলিত করিল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, সে হতে পারে না। মা না বললে আমি চরণকে এখানে আনতে পারিনে।

ব্রজেশ্বরী কহিল, অন্ততঃ একবার গিয়ে দেখে এসো, তাঁরা কেমন আছেন।

কুঞ্জনাথ চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! দশ-বিশটা রোজ মরচে সেখানে।

তবে কোন লোক পাঠিয়ে দাও, খবর আনুক।

তা হতে পারে বটে। বলিয়া কুঞ্জ লোকের সন্ধানে বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে কুসুম স্নান করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, দাসী উঠান ঝাঁট দিতে দিতে বলিল, মা বারণ করলেন দিদিঠাকরুন, আজ আর রান্নাঘরে ঢুকো না।

কথাটা শুনিয়াই তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে বলিল, কেন?

সে ত জানিনে দিদি, বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

ফিরিয়া আসিয়া কুসুম অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসিয়া রহিল। অন্যদিন এই সময়টুকুর মধ্যে কতবার ব্রজেশ্বরী আসে যায়, কিন্তু আজ তাহার দেখা নাই। বাহির হইয়া একবার খুঁজিয়াও আসিল, কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না।

সে মায়ের ঘরে লুকাইয়া বসিয়াছিল, কারণ এ-ঘরে কুসুম আসে না, তাহা সে জানিত। প্রত্যহ উভয়ে একত্রে আহার করিত, আজ সে-সময়ও যখন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন উদ্বেগ, আশঙ্কা, সংশয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সে আর-একবার ব্রজেশ্বরীর সন্ধানে বাহিরে আসিতেছিল, মা সুমুখে আসিয়া বলিলেন, আর দেরি করে কি হবে বাছা, যাও একটা ডুব দিয়ে এস, এ-বেলার মত যা হোক মুখে দাও—তোমার দাদা ঠাকুরবাড়িতে মত জানতে গেছে।

কুসুম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু মুখের মধ্যে জিহ্বা কাঠের মত শক্ত হইয়া রহিল।

তখন মা নিজেই একটু করুণ সুরে বলিলেন, ব্যাটার বৌ যখন, তখন ব্যাটার মতই অশৌচ মানতে হবে। যাই হোক, মাগী দোষেগুণে ভালমানুষই ছিল। সেদিন আমার ব্রজেশ্বরীর সম্বন্ধ করতে এসে কত কথা! আজ ছ'দিন হয়ে গেল, বৃন্দাবনের মা মরেচে—তা সে যা হবার হয়েচে, এখন মহাপ্রভু ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিন। কি নাম বাছা তার? চরণ না? আহা! রাজপুত্তর ছেলে, আজ সকালে তারও দু'বার ভেদবমি হয়েচে।

কুসুম মুখ তুলিল না, কথা কহিল না, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বেলা প্রায় তিনটা বাজে, ব্রজেশ্বরী এঘর-ওঘর খুঁজিয়া কোথাও কুসুমের সন্ধান না পাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরঝিকে তোরা কেউ দেখেছিস রে?

না দিদি, সেই সকালে দেখেছিলুম।

পত্নীর কান্নার শব্দে কুঞ্জনাথ কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, সে কি কথা? কোথায় গেল তবে সে?

ব্রজেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, জানিনে, আমি ঘরদোর, পুকুর, বাগান সমস্ত খুঁজেচি, কোথাও দেখতে পাচ্চিনে।

চোখের জল ও পুকুরের উল্লেখে কুঞ্জ কাঁদিয়া উঠিল-তবে সে আর নেই। মার গঞ্জনা সইতে না পেরে নিশ্চয় সে ডুবে মরেচে, বলিয়া ছুটিয়া বাইরে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, শোনো—অমন করে যেয়ো না—

আমি কিছু শুনতে চাইনে, বলিয়া এক টান মারিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া কুঞ্জ পাগলের মত দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে মেয়েমানুষের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, মা আমার বোনকে মেরে ফেলেচে—আর আমি থাকব না, আর এ বাড়ি ঢুকব না—ওরে কুসুম রে—

তাহার শাশুড়ি কিছুই জানিতেন না, চিৎকারের শব্দে বাহিরে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কুঞ্জ সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া সজোরে মাথা খুঁড়িতে লাগিল—ওই রাক্ষুসীই আমার ছোটবোনটিকে খেয়েচে—ওরে কেন মরতে আমি এখানে এসেছিলুম রে—ওরে আমার কি হল রে!

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই সে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল—দূর হ—দূর হ! ছুঁসনি আমাকে।

ব্রজেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবার জোর করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, শুধু কাঁদলে আর চেঁচালেই কি বোনকে ফিরে পাবে? আমি বলচি সে কক্ষনো ডুবে মরেনি!

কুঞ্জ বিশ্বাস করিল না, একভাবেই কাঁদিতে লাগিল। এই বোনকে সে অনেক দুঃখ-কষ্টে মানুষ করিয়াছে এবং যথার্থই তাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিত। পূর্বে অনেকবার কুসুম রাগ করিয়া জলে ডোবার ভয় দেখাইয়াছে—এখন তাহার সমস্ত বুক ভরিয়া কোথাকার খানিকটা জল এবং তাহার অভিমানিনী ছোটবোনটির মৃতদেহ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সস্নেহে স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, তুমি স্থির হও—আমি নিশ্চয়ই বলচি, সে মরেনি।

কুঞ্জ সজলচক্ষে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার স্ত্রী, আর একবার ভাল করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া বলিল, আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, ঠাকুরঝি লুকিয়ে বাড়লে চলে গেছেন।

কুঞ্জ অবিশ্বাস করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, সেখানে সে যাবে না। চরণকে ছাড়া তাদের কাউকে সে দেখতে পারত না।

ব্রজেশ্বরী কহিল, এটা তোমাদের পাহাড়-পর্বত ভুল! আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি, সেও তার স্বামীকে তেমনি ভালবাসে। সে যাই হোক, চরণের জন্যও ত সে যেতে পারে!

কিন্তু সে ত বাড়লের পথ চেনে না?

সেইটাই শুধু আমার ভয়, পাছে ভুল করে পৌছুতে দেরি হয়। কিংবা পথে আর কোন বিপদে পড়ে, নইলে বাড়ল সাত-সমুদ্র তের-নদীর পারে হলেও, সে একদিন না একদিন জিজ্ঞেস করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হবে। আমার কথা শোনো, তুমিও সেই পথ ধরে যাও। যদি পথে দেখা পাও, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে ফিরে এসো।

চললুম, বলিয়া কুঞ্জ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ তাহার চকচকে বিলাতি জুতা, বহুমূল্য রেশমের চাদর এবং গগনস্পর্শী বিরাট চাল শ্বশুরবাড়িতেই পড়িয়া রহিল। পোড়ারমুখী কুসীর শোকে,

জমিদার কুঞ্জনাথবাবু ফেরিওয়ালা কুঞ্জ বোষ্টমের সাজে খালি পায়ে, খালি গায়ে পাগলের মত দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ছয়দিন হইল বৃন্দাবনের জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর পর কেহ কোনদিন এ অধিকার সুকৃতিবলে পাইয়া থাকিলে, তিনিও পাইয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সেদিন তারিণী মুখুয্যের দুর্ব্যবহারে ও ঘোষাল মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিসম্পাতে অতিশয় পীড়িত হইয়া বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে একটা আধুনিক ধরনের লোহার নলের কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করে। যাহার জল কোন উপায়েই কেহ দূষিত করিতে পারিবে না এবং যৎসামান্য আয়াস স্বীকার করিয়া আহরণ করিয়া লইয়া গেলে সমস্ত গ্রামবাসীর অভাব মোচন করিয়া দুঃসময়ে বহু পরিমাণে মারীভয় নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে, এমনি একটা বড়-রকমের কূপ, যত ব্যয়ই হোক, নির্মাণ করাইবার অভিপ্রায়ে সে কলিকাতার কোন বিখ্যাত কল-কারখানার ফার্মে পত্র লিখিয়াছিল, কোম্পানী লোক পাঠাইয়াছিলেন, জননীর মৃত্যুর দিন সকালে তাহারই সহিত বৃন্দাবন কথাবার্তা ও চুক্তিপত্র সম্পূর্ণ করিতেছিল। বেলা প্রায় দশটা, দাসী ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, দাদাবাবু, এত বেলা হয়ে গেল, মা কেন দোর খুলচেন না?

বৃন্দাবন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রশ্ন করিল, মা কি এখনো শুয়ে আছেন?

হাঁ দাদা, ভেতর থেকে বন্ধ, ডেকেও সাড়া পাচ্চিনে।

বৃন্দাবন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কপাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া ডাকিল, ওমা—মাগো!

কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, তথাপি ভিতর হইতে শব্দমাত্র আসিল না। তখন লোহার শাবলের চাড় দিয়া রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া ফেলামাত্রই, ভিতর হইতে একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ যেন মুখের উপর

সজোরে ধাক্কা মারিয়া সকলকে বিমুখ করিয়া ফেলিল। সে ধাক্কা বৃন্দাবন মুহূর্তের মধ্যে সামলাইয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া ভিতরে চাহিল।

শয্যা শূন্য। মা মাটিতে লুটাইতেছেন—মৃত্যু আসন্নপ্রায়। ঘরময় বিসূচিকার ভীষণ আক্রমণের সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান। যতক্ষণ তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল, উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, অবশেষে অশক্ত, অসহায়, মেঝেয় পড়িয়া আর উঠিতে পারেন নাই। জীবনে কখনও কাহাকে বিন্দুমাত্র ক্লেশ দিতে চাহিতেন না, তাই মৃত্যুর কবলে পড়িয়াও অত রাত্রে ডাকাডাকি করিয়া কাহারও ঘুম ভাঙ্গাইতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। সারারাত্রি ধরিয়া তাঁহার কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিবার অপেক্ষা রহিল না। মাতার এমন অকস্মাৎ, এরূপ শোচনীয় মৃত্যু চোখে দেখিয়া সহ্য করা মানুষের সাধ্য নহে। বৃন্দাবনও পারিল না। তথাপি নিজেকে সোজা রাখিবার জন্য একবার প্রাণপণ-বলে চৌকাঠ চাপিয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া জননীর পায়ের কাছে গড়াইয়া পড়িল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে আনা হইল; মিনিট-কুড়ি পরে সচেতন হইয়া দেখিল, মুখের কাছে বসিয়া চরণ কাঁদিতেছে। বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল, এবং ছেলের হাত ধরিয়া মৃতকল্প জননীর পদপ্রান্তে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল।

যে লোকটা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি নেই। কোথায় গেছেন, এ বেলা ফিরবেন না।

মায়ের সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান ছিল, পুত্র ও পৌত্রকে কাছে পাইয়া তাঁহার জ্যোতিঃহীন দুই চক্ষের প্রান্ত বাহিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপাইয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলকেই আশীর্বাদ করিলেন, তাহা কাহারও কানে গেল না বটে, কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে পৌঁছিল।

তখন তুলসীমঞ্চমূলে শয্যা পাতিয়া তাঁহাকে শোয়ান হইল, কতক্ষণ গাছের পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পরে মিলন-শ্রান্ত চক্ষু দুটি সংসারের শেষ নিদ্রায় ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইয়া গেল।

অতঃপর এই ছয়টা দিন-রাত বৃন্দাবনের কাটিল শুধু এই জন্যে যে তাহা ভগবানের হাতে। তাহার নিজের হাতে থাকিলে কাটিত না।

কিন্তু চরণ আর খেলাও করে না, কথাও কহে না। বৃন্দাবন তাহাকে কত রকমের মূল্যবান খেলনা কিনিয়া দিয়াছিল—নানাবিধ কলের গাড়ি, জাহাজ, ছবি-দেওয়া পশুপক্ষী—যে-সমস্ত লইয়া ইতিপূর্বে সে নিয়তই ব্যস্ত থাকিত, এখন তাহা ঘরের কোণে পড়িয়া থাকে, সে হাত দিতেও চাহে না।

সে বিপদের দিনে এই শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিবার কথাও কাহারো মনে হয় নাই। তাহার ঠাকুরমাকে যখন চাদর-চাপা দিয়া খাটে তুলিয়া বিকট হরিধ্বনি দিয়া লইয়া যায়, তখন সে তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়াছিল।

কেন ঠাকুরমা তাহাকে সঙ্গে লইলেন না, কেন গরুর গাড়ির বদলে মানুষের কাঁধে অমন করিয়া মুড়িসুড়ি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন, কেন ফিরিয়া আসিতেছেন না, কেন বাবা এত কাঁদেন, ইহাই সে যখন তখন আপন মনে চিন্তা করে। তাহার এই হতাশ বিহ্বল বিষণ্ণ মূর্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, করিল না শুধু তাহার পিতার। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু বৃন্দাবনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, কোনদিকে মনোযোগ করিবার, বুদ্ধিপূর্বক চাহিয়া দেখিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল না। তাহার উদাস উদ্ভ্রান্ত

দৃষ্টির সম্মুখে যাহাই আসিত, তাহাই ভাসিয়া যাইত, স্থির হইতে পাইত না।

এ-কয়দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহার শিক্ষক দুর্গাদাসবাবু আসিয়া বসিতেন, কতরকম করিয়া বুঝাইতেন, বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিত বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কিছু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ এই একটা ভাব তাহাকে স্থায়ীরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল যে, অকস্মাৎ অকূল সমুদ্রের মাঝখানে তাহার জাহাজের তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিলেও এ ভগ্নপোত কিছুতেই বন্দরে পৌঁছিবে না। শেষ পরিণতি যাহার সমুদ্রগর্ভে, তাহার জন্য হাঁপাইয়া মরিয়া

লাভ কি! এমন না হইলে তাহার অমন স্ত্রী জীবনের সূর্যোদয়েই চরণকে রাখিয়া অপসৃত হইত না, এমন অসময়ে কুসুমেরও হয়ত দয়া হইত, এত নিষ্ঠুর হইয়া চরণকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না।

এবং সকলের উপর তাহার মা। এমন মা কে কবে পায়? তিনিও যেন স্বেচ্ছায় বিদায় হইয়া গেলেন—যাইবার সময় কথাটি পর্যন্ত কহিয়া গেলেন না। এমনি করিয়া তাহার বিপর্যস্ত মস্তিষ্কে বিধাতার ইচ্ছা যখন প্রত্যহ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া দেখা দিতে লাগিল, তখন বাড়ির পুরাতন দাসী আসিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, দাদা, শেষকালে ছেলেটাকেও কি হারাতে হবে? একবার তাকে তুমি কাছে ডাকো না, আদর কর না, চেয়ে দেখ দেখি, কিরকম হয়ে গেছে!

তাহার কথাগুলো লাঠির মত বৃন্দাবনের মাথায় পড়িয়া তন্দ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়া দিল, সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, কি হয়েচে চরণের?

দাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বালাই, ষাট! হয়নি কিছু—আয় বাবা চরণ, কাছে আয়—বাবা ডাকচেন।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ধীরপদে চরণ আড়াল হইতে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল—চরণ, তুইও কি যাবি নাকি রে!

দাসী ধমক দিয়া উঠিল—ছিঃ, ও কি কথা দাদা?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আজ অনেকদিনের পর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল।

দাসী নিজের কাজে চলিয়া গেলে চরণ চুপি চুপি আবেদন করিল, মার কাছে যাব বাবা।

সে যে ঠাকুরমার কাছে যাইতে চাহে নাই, ইহাতেই বৃন্দাবন মনে মনে ভারী আরাম বোধ করিল, আদর করিয়া বলিল, তোর মা ত সে বাড়িতে নেই চরণ।

কখন আসবেন তিনি?

সে ত জানিনে বাবা। আচ্ছা, আজই আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চি।

চরণ খুশি হইল। সেইদিনই বৃন্দাবন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চরণকে আসিয়া লইয়া যাইবার জন্য কেশবকে চিঠি লিখিয়া দিল। গ্রামের ভীষণ অবস্থাও সেই পত্রে লিখিয়া জানাইল।

মায়ের শ্রাদ্ধের আর দুইদিন বাকি আছে; সকালে বৃন্দাবন চন্ডীমন্ডপে কাজে ব্যস্ত ছিল, খবর পাইল, ভিতরে চরণের ভেদবমি হইতেছে। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সে নির্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ভেদবমির চেহারায় বিসূচিকা মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছে।

বৃন্দাবনের চোখের সুমুখে সমস্ত জগৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, হাত-পা দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, একবার কেশবকে খবর দাও, বলিয়া সে সন্তানের শয্যার নীচে মড়ার মত শুইয়া পড়িল।

ঘণ্টা-খানেক পরে গোপাল ডাক্তারের বসিবার ঘরে বৃন্দাবন তাহার পা-দুটো আকুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, দয়া করুন ডাক্তারবাবু, ছেলেটিকে বাঁচান! আমার অপরাধ যতই হয়ে থাক, কিন্তু, সে নির্দোষ। অতি শিশু, ডাক্তারবাবু—একবার পায়ের ধূলো দিন, একবার তাকে দেখুন! তার কষ্ট দেখলে আপনারও মায়া হবে!

গোপাল বিকৃত মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, তখন মনে ছিল না যে, তারিণী মুখুয্যে এই ডাক্তারবাবুরই মামা? ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান! সে সময়ে মনে হয়নি, এই পা-দুটোই মাথায় ধরতে হবে!

বৃন্দাবন কাঁদিয়া কহিল, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পা ছুঁয়ে বলচি, তারিনী ঠাকুরকে আমি কিছুমাত্র অপমান করিনি। যা তাঁকে নিষেধ করেছিলাম—সমস্ত গ্রামের ভালর জন্যই করেছিলাম। আপনি ডাক্তার, আপনি ত জানেন এ সময় খাবার জল নষ্ট করা কি ভয়ানক অন্যায়!

গোপাল পা ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, অন্যায় বৈ কি! মামা ভারী অন্যায় করেচে। আমি ডাক্তার আমি জানিনে, তুমি দুর্গাদাসের কাছে দু' ছত্তর ইংরিজি পড়ে আমাকে জ্ঞান দিতে এসেচ! অতবড় পুকুরে দুখানা কাপড় কাচলে জল নষ্ট হয়! আমি কচি খোকা! এ আর কিছু নয় বাপু, এ শুধু টাকার গরম। ছোটলোকের টাকা হলে যা হয় তাই! নইলে বামুনের তুমি ঘাট বন্ধ করতে চাও! এত দর্প! অত অহঙ্কার! যাও—যাও—আমি তোমার বাড়ি মাড়াব না।

ছেলের জন্য বৃন্দাবনের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ডাক্তারের পা জড়াইয়া ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল—ঘাট মানচি, পায়ের ধূলো মাথায় নিচ্চি ডাক্তারবাবু, একবার চলুন! শিশুর প্রাণ বাঁচান। এক শ টাকা দেব—দু'শ টাকা, পাঁচ শ টাকা—যা চান দেব ডাক্তারবাবু, চলুন—ওষুধ দিন।

পাঁচ শ টাকা!

গোপাল নরম হইয়া বলিলেন, কি জান বাপু, তা হলে খুলে বলি। ওখানে গেলে আমাকে একঘরে হতে হবে।

এইমাত্র তাঁরাও এসেছিলেন,—না বাপু, তারিণীমামা অনুমতি না দিলে আমার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ আহার-ব্যবহার বন্ধ করে দেবে। নইলে আমি ডাক্তার, আমার কি! টাকা নেব, ওষুধ দেব। কিন্তু, সে ত হবার জো নেই! তোমার ওপর দয়া করতে গিয়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে-পৈতে দেব কি করে বাপু? কাল আমার মা মরলে গতি হবে তাঁর কি করে বাপু? তখন তোমাকে নিয়ে ত আমার কাজ চলবে না। বরং এক কাজ কর, ঘোষালমশায়কে নিয়ে মামার কাছে যাও—তিনি প্রাচীন লোক, তাঁর কথা সবাই শোনে—হাতে-পায়ে ধর গে—কি জান

বৃন্দাবন, তাঁরা একবার বললেই আমি—আজকাল টাটকা ভাল ভাল ঔষধ এনেচি—দিলেই সেরে যাবে।

বৃন্দাবন বিহ্বলদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, গোপাল ভরসা দিয়ে পুনরায় কহিলেন, ভয় নেই ছোকরা, যাও দেরি করো না। আর দেখ বাপু, আমার টাকার কথাটা সেখানে বলে কাজ নেই—যাও, ছুটে যাও।

বৃন্দাবন ঊর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে তারিণীর শ্রীচরণে আসিয়া পড়িল।

তারিণী লাথি মারিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া পিশাচের হাসি হাসিয়া কহিলেন, সন্ধ্যে-আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে। কেমন, ফলল কি না! নির্বংশ হলি কি না!

বৃন্দাবনের কান্না শুনিয়া তারিণীর স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া স্বামীকে বলিলেন, ছি ছি, এমন অধর্মের কাজ করো না। যা হবার হয়েচে—আহা শিশু নাবালক—বলে দাও গোপালকে, ওষুধ দিক।

তারিণী খিঁচাইয়া উঠিল—তুই থাম মাগী! পুরুষমানুষের কথায় কথা কস নে।

তিনি থতমত খাইয়া বৃন্দাবনকে বলিলেন, আমি আশীর্বাদ কচ্চি বাবা, তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে, বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন পাগলের মত কাতরোক্তি করিতে লাগিল, তারিণীর হাতে—পায়ে ধরিতে লাগিল, না তবু না।

এমন সময় শাস্ত্রজ্ঞ ঘোষালমহাশয় পাশের বাড়ি হইতে খড়ম পায়ে দিয়া খটখট করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, শাস্ত্রে আছে কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। ছোটলোককে শাসন না করলে সমাজ উচ্ছন্ন যায়। এমনি করেই কলিকালে ধর্মকর্ম, ব্রাহ্মণের সম্মান লোপ পাচ্চে—কেমন হে তারিণী, সেদিন বলিনি তোমাকে, বেন্দা বোষ্টমের ভারী বাড় বেড়েচে।

যখন ও আমার কথা মানলে না, তখনই জানি, ওর উপর বিধি বাম! আর রক্ষে নেই! হাতে হাতে ফল দেখলে তারিণী?

তারিণী মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া কহিল, আর আমি! সেদিন পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে পৈতে হাতে করে বলেছিলাম, নির্বংশ হ। খুড়ো, আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে! এখনও চন্দ্রসূর্য উঠচে, এখনও জোয়ার-ভাঁটা খেলচে! বলিয়া ব্যাধ যেমন করিয়া তাহার স্ব-শরবিদ্ধ ভূপাতিত জন্তুটার মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রতি চাহিয়া নিজের অব্যর্থ লক্ষ্যের আস্বাদন করিতে থাকে, তেমনি পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া তারিণী এই একমাএ পুএশোকাহত হতভাগ্য পিতার অপরিসীম ব্যথা সর্বাগ্রে উপভোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়ইল। প্রাণের দায়ে সে অনেক সাধিয়াছিল, অনেক বলিইয়াছিল, আর একটি কথাও বলিল না। নিদারুণ অজ্ঞান ও অন্ধতম মূঢ়ত্বের অসহ্য অত্যাচার এতক্ষণে তাহার পুত্র-বিয়োগ-বেদনাকেও অতিক্রম করিয়া তাহার আত্মসম্ভ্রমকে জাগাইয়া দিল। সমস্ত গ্রামের মঙ্গল-কামনার ফলে এই দুই অধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাহার গায়ত্রী ও সন্ধ্যা-আহ্নিকের তেজে সে নির্বংশ হইতে বসিয়াছে, এই বাক্বিতণ্ডার শেষ-মীমাংসা না শুনিয়াই সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল এবং বেলা দশটার সময় নিরুদ্বিগ্ন শান্তমুখে পীড়িত সন্তানের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেশব তখন আগুন জ্বালিয়া চরণের হাতে-পায়ে সেক দিতেছিল এবং তাহার নিদাঘতপ্ত মরুতৃষ্ণার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল। বৃন্দাবনের মুখে সমস্ত শুনিয়া সে উঃ—করিয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিল এবং একটা উড়নি কাঁধে ফেলিয়া বলিল, কলকাতার চললুম।

যদি ডাক্তার পাই, সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব, না পাই, এই যাওয়াই শেষ যাওয়া। উঃ—এই ব্রাহ্মণই একদিন সমস্ত পৃথিবীর গর্বের বস্তু ছিল—ভাবলেও বুক ফেটে

যায় হে বৃন্দাবন! চললুম, পার ত ছেলেটারে বাঁচিয়ে রেখ ভাই! বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

কেশব চলিয়া গেলে, পিতাকে কাছে পাইয়া, মার কাছে যাব, বলিয়া ভয়ানক কান্না জুড়িয়া দিল। সে স্বভাবতঃ শান্ত, কোনদিনই জিদ করিতে জানিত না, কিন্তু আজ তাহাকে ভুলাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন কাজ হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ বেলা যত পড়িয়া আসিতে লাগিল, রোগের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৃষ্ণার হাহাকার এবং মায়ের কাছে যাইবার উন্মত্ত চিৎকারে সে সমস্ত লোককে পাগল করিয়া তুলিল। এই চিৎকার বন্ধ হইল অপরাহ্নে, যখন হাতে পায়ে পেটে খিল ধরিয়া কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

চৈত্রের স্বল্প দিনমান শেষ হয়-হয়, এমন সময়ে কেশব ডাক্তার লইয়া বাড়ি ঢুকিল। ডাক্তার তাহারই সমবয়সী এবং বন্ধু, ঘরে ঢুকিয়া চরণের দিকে চাহিয়াই মুখ গম্ভীর করিয়া একাধারে বসিলেন। কেশব সভয়ে তাঁহার মুখপানে চাহিতেই তিনি কি বলিতে গিয়া বৃন্দাবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থামিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন তাহা দেখিল, শান্তভাবে কহিল, হাঁ, আমিই বাপ বটে; কিন্তু কিছুমাত্র সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই, আপনার যাহা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বলুন। যে বাপ, বারো ঘণ্টাকাল বিনা চিকিৎসায় একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বসে থাকতে পারে, তার সমস্ত সহ্য হয় ডাক্তারবাবু।

পিতার এত বড় ধৈর্যে ডাক্তার মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তথাপি ডাক্তার হইলেও সে মানুষ, যে কথা তাহার বলিবার ছিল, পিতার মুখের উপর উচ্চারণ করিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিল।

বৃন্দাবন বুঝিয়া কহিল, কেশব, এখন আমি চললুম। পাশেই ঠাকুর-ঘর, আবশ্যক হলে ডেকো। আর একটা কথা ভাই, শেষ হবার আগে খবর দিয়ো, আর একবার যেন দেখতে পাই, বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন যখন ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিল, তখন ঘরের আলো ম্লান হইয়াছে। ডান দিকে চাহিয়া দেখিল, ঐখানে বসিয়া মা জপ করিতেন। হঠাৎ সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল—যেদিন তাহারা কুঞ্জনাথের ঘরে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল, মা যেদিন কুসুমকে বালা পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিয়া ঐখানে চরণকে লইয়া বসিয়া ছিলেন; আর সে আনন্দোন্মত্ত হৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিয়া দিতে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়াছিল। আর আজ, কি নিবেদন করিতে সে ঘরে ঢুকিয়াছে? বৃন্দাবন লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, পাশের ঘরেই আমার চরণ মরিতেছে, ভগবান, আমি সে নালিশ জানাইতে আসি নাই, কিন্তু পিতৃস্নেহ যদি তুমিই দিয়াছ, তবে বাপের চোখের উপর বিনা চিকিৎসায়, এমন নিষ্ঠুরভাবে তাহার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করিলে কেন? পিতৃহৃদয়ে এতটুকু সান্ত্বনার পথ খুলিয়া রাখিলে না কিজন্য? তাহার স্মরণ হইল, বহু লোকের বহুবার কথিত সেই বহু পুরাতন কথাটা—সমস্ত মঙ্গলের নিমিত্ত! সে মনে মনে বলিল, যাহারা তোমাকে বিশ্বাস করে না তাহাদের কথা তাহারাই জানে, কিন্তু আমি ত নিশ্চয় জানি, তোমার ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি শুষ্ক পাতাও মাটিতে পড়ে না; তাই আজ এই প্রার্থনা শুধু করি জগদীশ্বর, বুঝাইয়া দাও, কি মঙ্গল ইহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছ? আমার এই অতি ক্ষুদ্র একফোঁটা চরণের মৃত্যুতে সংসারে কাহার কি উপকার সাধিত হইবে? যদিও সে জানিত, জগতের সমস্ত ঘটনাই মানবের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, তথাপি, এই কথাটার উপর সে সমস্ত চিত্ত প্রাণপণে একাগ্র করিয়া পড়িয়া রহিল, কেন চরণ জন্মিল, কেনই বা এত বড় হইল এবং কেনই বা তাহাকে একটি কাজ করিবারও অবসর না দিয়া ডাকিয়া লওয়া হইল!

কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত রাত্রির কর্তব্য সম্পন্ন করিতে ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার পদশব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া যখন বৃন্দাবন উঠিয়া গেল, তখন তাহার উদ্দাম ঝঞ্ঝা শান্ত হইয়াছে। গগনে আলোর আভাস তখনো ফুটিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু

মেঘ-মুক্ত নির্মল স্বচ্ছ আকাশের তলে ভবিষ্যৎ-জীবনের অস্পষ্ট পথের রেখা চিনিতে পারিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া সে প্রাঙ্গণের একধারে দ্বারের অন্তরালে একটি মলিন স্ত্রী-মূর্তি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কে ওখানে অমন আঁধারে আড়ালে বসিয়া আছে!

বৃন্দাবন কাছে সরিয়া আসিয়া এক মুহূর্ত ঠাহর করিয়াই চিনিতে পারিল, সে কুসুম।

তাহার জিহ্বাগ্রে ছুটিয়া আসিল, কুসুম, আমার ষোল-আনা সুখ দেখিতে আসিলে কি? কিন্তু বলিল না।

এইমাত্র সে নাকি তাহার চরণের শিশু-আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে নিজের সমস্ত সুখদুঃখ, মান-অভিমান বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিল, তাই, হীন প্রতিহিংসা সাধিয়া মৃত্যুশয্যাশায়ী সন্তানের অকল্যাণ করিতে ইচ্ছা করিল না; বরং করুণকণ্ঠে বলিল, আর একটু আগে এলে চরণের বড় সাধ পূর্ণ হত। আজ সমস্ত দিন যত যন্ত্রণা পেয়েচে, ততই সে তোমার কাছে যাবার জন্য কেঁদেচে—কি ভালই তোমাকে সে বেসেছিল! কিন্তু, এখন আর জ্ঞান নেই—এসো আমার সঙ্গে।

কুসুম নিঃশব্দে স্বামীর অনুসরণ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া বৃন্দাবন হাত দিয়া চরণের অন্তিম-শয্যা দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐ চরণ শুয়ে আছে—যাও, নাও গে। কেশব, ইনি চরণের মা। বলিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা কেহই যখন কুসুমের সুমুখে গিয়া ও-কথা বলিতে সাহস করিল না, কুঞ্জনাথ পর্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া গেল, তখন বৃন্দাবন ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল, ওর মৃতদেহটা ধরে রেখে লাভ কি, ছেড়ে দাও, ওরা নিয়ে যাক।

কুসুম মুখ তুলিয়া বলিল, ওদের আসতে বল, আমি নিজেই তুলে দিচ্ছি।

তারপর সে যেরূপ অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত চরণের মৃতদেহ শ্মশানে পাঠাইয়া দিল, দেখিয়া বৃন্দাবনও মনে মনে ভয় পাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চরণের ক্ষুদ্র দেহ পুড়িয়া ছাই হইতে বিলম্ব হইল না। কেশব সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ভয়ঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—সমস্ত মিছে কথা! যারা কথায় কথায় বলে—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য, তারা শয়তান, হারামজাদা, জোচ্চোর!

বৃন্দাবন দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া অদূরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, ঘোর রক্তবর্ণ শ্রান্ত দুই চোখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া দেখিয়া কহিল, শ্মশানে রাগ করতে নেই কেশব।

প্রত্যুত্তরে কেশব 'উঃ'–বলিয়া চুপ করিল।

ফিরিয়া আসিবার পথে বাগদীদের দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে গাছতলায় খেলা করিতেছিল, বৃন্দাবন থমকিয়া দাড়াঁইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শিশুরা খেলার ছলে আর একটা গাছতলায় যখন ছুটিয়া চলিয়া গেল, বৃন্দাবন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, কেশব, কাল থেকে অহর্নিশি যে প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঠেচে, এখন বোধ করি তার জবাব পেলাম—সংসারের এক ছেলে মরারও প্রয়োজন আছে।

কেশব এইমাত্র গালাগালি করিতেছিল, অকস্মাৎ এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল।

বৃন্দাবন কহিল, তোমার ছেলে নেই, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমার জ্বালা বুঝবে না—বোঝা অসম্ভব। এ এমন জ্বালা যে, মহাশত্রুর জন্যও কেউ কামনা করে না। কিন্তু এর দামও আছে কেশব, এখন যেন টের পাচ্ছি, খুব বড়-রকমের দামই আছে। তাই বোধ হয়, ভগবান এরও ব্যবস্থা করেছেন।

কেশব তেমনি নিরুত্তর-মুখে চাহিয়া রহিল; বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, এই জ্বালা আমার জুড়িয়ে যাচ্ছিল ওই শিশুদের পানে চেয়ে। আজ আমি সকলের মুখেই চরণের মুখ দেখচি, সব শিশুকেই বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে হচ্চে—চরণ বেঁচে থাকতে ত একটা দিনও এমন হয়নি!

কেশব অবনতমুখে শুনিতে শুনিতে চলিতে লাগিল। পাঠশালার পোড়ো বনমালী ও তাহার ছোটভাই জলপান ও জল লইয়া যাইতেছিল, বৃন্দাবন ডাকিয়া বলিল, বনমালী কোথায় যাচ্ছিস রে?

বাবাকে জলপান দিতে মাঠে যাচ্ছি পণ্ডিতমশাই।

আমার কাছে একবার আয় তোরা, বলিয়া নিজেই দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া উভয়কেই একসঙ্গে বুকের উপর টানিয়া লইয়া পরম স্নেহে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আঃ—আঃ, বুক জুড়িয়ে গেল রে বনমালী! কেশব, কাল বড় ভয় হয়েছিল ভাই, চরণকে বুঝি সত্যই হারালাম। না, আর ভয় নেই, আর তাকে হারাতে হবে না—এদের ভেতরেই চরণ আমার মিশিয়ে আছে, এদের ভেতর থেকেই একদিন তাকে ফিরে পাবো।

কেশব সভয়ে এদিকে-ওদিকে চাহিয়া বলিল, ছেড়ে দাও হে বৃন্দাবন, ওদের মা কি কেউ দেখতে পেলে ভারী রাগ করবে।

ওঃ—তা বটে। আমি চরণকে পুড়িয়ে আসছি যে! বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বনমালী পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহারে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, ছাড়া পাইয়া ভাইকে লইয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পণ্ডিতমশাই সেইখানে পথের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঊর্ধ্বমুখে হাতজোড় করিয়া বলিল, জগদীশ্বর! চরণকে নিয়েছ, কিন্তু আমার চোখের এই দৃষ্টিটুকু যেন কেড়ে নিয়ো না! আজ যেমন দেখতে দিলে, এমনি যেন চিরদিন সকল শিশুর মুখেই আমার চরণের মুখ দেখতে পাই। এমনি বুকে নেবার জন্যে

যেন চিরদিন দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারি! কেশব, শ্মশানে দাঁড়িয়ে যাঁদের গাল দিচ্ছিলে, তাঁরা সকলেই হয়ত জোচ্চোর নন।

কেশব হাত ধরিয়া বলিল, বাড়ি চল।

চল, বলিয়া বৃন্দাবন অতি সহজেই দাঁড়াইল। দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, আজ আমার বাচালতা মাপ করো ভাই। কেশব, মনের ওপর বড় গুরুভার চেপেছিল, এ শাস্তি আমার কেন? জ্ঞানতঃ এমন কিছু গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিনি যে, ভগবান এত বড় দণ্ড আমাকে দিলেন, আমার—

কথাটা সম্পূর্ণ না হইতেই কেশব উদ্ধতভাবে গর্জিয়া উঠিল, জিজ্ঞেস কর গে ওই হারামজাদা বুড়ো ঘোষালকে—সে বলবে, তার জপ-তপের তেজে; জিজ্ঞেস কর গে আর এক জোচ্চোরকে—সে বলবে, পূর্বজন্মের পাপে—উঃ—এই দেশের ব্রাহ্মণ!

বৃন্দাবন ধীরভাবে বলিল, কেশব, গোখরো সাপের খোলসকে লাঠির আঘাত করে লাভ নেই, পচা ঘোলের দুর্গন্ধের অপবাদ দুধের ওপর আরোপ করাও ভুল। অজ্ঞান ব্রাহ্মণকেও কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে, তাই বরং দ্যাখো।

কেশব সেইসব কথা স্মরণ করিয়া ক্রোধে ক্ষোভে অন্তরে পুড়িয়া যাইতেছিল, যা মুখে আসিল বলিল, তবে এতবড় দণ্ড কেন?

বৃন্দাবন কহিল, দণ্ড ত নয়। সেই কথাই তোমাকে বলছিলুম কেশব, যখন কোন পাপের কথাই মনে পড়ে না, তখন এ আমার পাপের শাস্তি স্বীকার করে, নিজেকে ছোট করে দেখতে আমি চাইনে। এ জীবনে স্মরণ হয় না, গত জীবনের ঘাড়েও নিরর্থক অপরাধ চাপিয়ে দিলে আত্মার অপমান করা হয়। সুতরাং আমার এ পাপের ফল নয়, অপরাধের শাস্তি নয়—এ আমার গুরুগৃহ-বাসের গৌরবের ক্লেশ। কোন বড় জিনিসই বিনা দুঃখে মেলে না কেশব, আজ আমার চরণের মৃত্যুতে যে শিক্ষা লাভ হল, তত বড় শিক্ষা, পুত্রশোকের মত মহৎ দুঃখ ছাড়া কিছুতেই মেলে না। বুক চিরে দেখাবার হলে তোমাকে দেখাতাম,

আজ পৃথিবীর যেখানে যত ছেলে আছে, তাদের সবাইকে আমার চরণ তার নিজের জায়গাটি ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি ব্রাহ্মণ, আজ আমাকে শুধু এই আশীর্বাদ কর, আজ যা পেয়েছি, তাকে যেন না হারিয়ে ফেলে সব নষ্ট করে বসি।

বৃন্দাবনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, দুই বন্ধু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সেদিন বৃন্দাবন একটিমাত্র কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল একটিই যথেষ্ট নহে। গ্রামের পূর্বদিকেই অধিকাংশ দুঃখী লোকের বাস; এ পাড়ায় আর একটা বড়-রকমের কূপ প্রস্তুত না করিলে জলকষ্ট এবং ব্যাধি-পীড়া নিবারিত হইবে না। তাই কেশব ফার্মের সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদ লইয়া আসিল যে, যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলে এমন কূপ নির্মাণ করা যাইতে পারে, যাহাতে শুধু একটা গ্রামের নয়, পাঁচ-সাতটা গ্রামেরও দুঃখ দূর করা যাইতে পারে; উপরন্তু, অসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে চাষ-আবাদেরও সাহায্য চলিতে পারিবে।

বৃন্দাবন খুশি হইয়া সম্মত হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের দিন, দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যতীত সমুদয় সম্পত্তি রেজেস্ট্রী করিয়া কেশবের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, কেশব, এই করো ভাই, বিষাক্ত জল খেয়ে আমার চরণের বন্ধুবান্ধবেরা যেন আর না মরে। আর আমার সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি এই পাঠশালা। এর ভারও যখন নিলে, তখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। যদি কোনদিন এদিকে ফিরে আসি, যেন দেখতে পাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও মানুষ হয়েচে। আমি সেইদিনে শুধু চরণের দুঃখ ভুলব।

দুর্গাদাসবাবু এ-কয়দিন সর্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, বৃন্দাবন, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার কথা খুঁজে পাইনে বাবা! কিন্তু দুঃখ যত বড়ই হোক, সহ্য করাই ত মনুষ্যত্ব। অক্ষম অপারগ হয়ে সংসার ত্যাগ করা কখনই ভগবানের অভিপ্রায় নয়।

বৃন্দাবন মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, সংসার ত্যাগ করার কোন সঙ্কল্প ত আমার নেই মাস্টারমশাই। বরং সে ত একেবারে অসম্ভব। ছেলেদের মুখ না দেখতে পেলে আমি একটা দিনও বাঁচব না। আপনার দয়ায় আমি পণ্ডিতমশাই বলে সকলের পরিচিত, আমার এ সম্মান আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না, আবার কোথাও গিয়ে এই ব্যবসাই আরম্ভ করে দেব।

দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, কিন্তু তোমার সর্বস্ব ত জলকষ্ট-মোচনের জন্য দান করে গেলে, তোমাদের ভরণপোষণ হবে কি করে?

বৃন্দাবন সলজ্জ হাস্যে দেয়ালে টাঙ্গানো ভিক্ষার ঝুলি দেখাইয়া বলিল, বৈষ্ণবের ছেলের কোথাও মুষ্টিভিক্ষার অভাব হবে না মাস্টারমশাই, এইতেই আমার বাকি দিনগুলো স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। তা ছাড়া সম্পত্তি আমার চরণের, আমি তারই সঙ্গী-সাথীদের জন্য দিয়ে গেলাম।

দুর্গাদাস ব্রাহ্মণ এবং প্রবীণ হইলেও শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, তাই তিনিও কুসুমের যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন। এখন তাহাই স্মরণ করিয়া বলিলেন, সেটা ভাল হবে না বাবা, তোমার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বৌমার পক্ষে সেটা বড় লজ্জার কথা। এমন হতেই পারে না বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন মুখ নিচু করিয়া কহিল, তিনি তাঁর ভায়ের কাছেই যাবেন।

দুর্গাদাস বৃন্দাবনকে ছেলের মত স্নেহ করিতেন, তাহার বিপদে এবং সর্বোপরি এই গৃহত্যাগের সঙ্কল্পে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া নিবৃত্ত করিবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, বৃন্দাবন, জন্মভূমি ত্যাগ করবার আবশ্যকতা কি? এখানে বাস করেও ত পূর্বের মত সমস্ত হতে পারে।

বৃন্দাবনের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, বলিল, ভিক্ষা ছাড়া আমার আর উপায় নেই, কিন্তু সে আমি এখানে পারব না। তা ছাড়া, এ বাড়িতে যেদিকেই চোখ পড়ছে, সেইদিকেই তার ছোট হাত-দুখানির চিহ্ন দেখতে পাচ্চি। আমাকে

ক্ষমা করুন মাস্টারমশাই, আমি মানুষ, মানুষের মাথা এ গুরুভারে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

দুর্গাদাস বিমর্ষমুখে মৌন রহিলেন।

যে ডাক্তার চরণের শেষ-চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সেদিনের মর্মান্তিক ঘটনা, তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার শেষ দেখিবার কৌতূহল ও বৃন্দাবনের প্রতি অদম্য আকর্ষণ তাঁহাকে সেইদিন সকালে বিনা-আহ্বানে আবার কলিকাতা হইতে টানিয়া আনিয়াছিল। এতক্ষণ তিনি নিঃশব্দে সমস্ত শুনিতেছিলেন; বৃন্দাবনের এতটা বৈরাগ্যের হেতু কোনমতে বুঝা যায়, কিন্তু কেশব কিসের জন্য সমস্ত উন্নতি জলাঞ্জলি দিয়া এই অতি তুচ্ছ পাঠশালার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছে, ইহাই বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেশব, সত্যই কি তুমি এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে পাঠশালা নিয়ে সারাজীবন থাকবে?

কেশব সংক্ষেপে কহিল, শিক্ষা দেওয়াই ত আমার ব্যবসা।

ডাক্তার ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, তা জানি, কিন্তু কলেজের প্রফেসারি এবং এই পাঠশালার পণ্ডিতি কি এক? এতে কি উন্নতি আশা কর শুনি?

কেশব সহজভাবে বলিল, সমস্তই। টাকা রোজকার—আর উন্নতি এক নয় অবিনাশ।

নয় মানি। কিন্তু এমন গ্রামে বাস করলেও যে মহাপাতক হয়! উঃ—মনে হলেও গা শিউরে ওঠে রে!

বৃন্দাবন হাসিল এবং কেশবের জবাব দিবার পূর্বেই কহিল, সে কি শুধু গ্রামেরই অপরাধ ডাক্তারবাবু, আপনাদের নয়? আজ আমার দুর্দশা দেখে শিউরে উঠেছেন, এমনি দুর্দশায় প্রতি বৎসর কত শিশু, কত নরনারী-হত্যা হয়, সে কি কারো কোনদিন চোখে পড়ে? আপনারা সবাই আমাদের এমন নির্মমভাবে ত্যাগ

করে চলে না গেলে, আমরা ত এত নিরুপায় হয়ে মরি না! রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু, কিন্তু যারা আপনাদের মুখের অন্ন, পরনের বসন যোগায়, সেই হতভাগ্য দরিদ্রের এইসব গ্রামেই বাস। তাদিকেই দু'পায়ে মাড়িয়ে থেঁত্লে থেঁত্লে আপনাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরি হয়। সেই উন্নতির পথ থেকে কেশব এম. এ. পাশ করেও স্বেচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েচে।

কেশব আনন্দে উৎসাহে সহসা বৃন্দাবনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, বৃন্দাবন, মানুষ হবার কত বড় সুযোগই না আমাকে দিয়ে গেলে! দশ বছর পরে একবার দয়া করে ফিরে এসো, দেখে যেয়ো তোমার জন্মভূমিতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি না।

দুর্গাদাস ও অবিনাশ ডাক্তার উভয়েই এই দুই বন্ধুর মুখের দিকে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

পরদিন বৃন্দাবন ভিক্ষার ঝুলিমাত্র সম্বল করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং ঘুরিতে ঘুরিতে যে-কোনস্থানে নিজের কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত করিয়া লইবে। কেশব তাহাকে তাহাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু বৃন্দাবন সম্মত হয় নাই। কারণ, সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধাকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে চাহে।

যাত্রার উদ্যোগ করিয়া সে দেবসেবার ভার পুরোহিত ও কেশবের উপর দিয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলের কথাই চিন্তা করিয়াছিল। মায়ের সিন্দুকের সঞ্চিত অর্থ তাহাদিগকে দিয়া বিদায় করিয়াছিল।

শুধু কুসুমের কথাই চিন্তা করিয়া দেখে নাই। প্রবৃত্তিও হয় নাই, আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। যেদিন সে চরণকে আশ্রয় দেয় নাই, সেইদিন হইতে তাহার প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব জমিয়া উঠিতেছিল, সেই বিতৃষ্ণা তাহার মৃত্যুর পরে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছিল।

তাই কেন কুসুম আসিয়াছে, কি করিয়া আসিয়াছে, কি জন্য আছে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র খোঁজ লয় নাই এবং না লইয়াই নিজের মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, আপনি আসিয়াছে, শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেলে আপনিই চলিয়া যাইবে। সে আসার পরে, যদিও কার্যোপলক্ষে বাধ্য হইয়া কয়েকবার কথা কহিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখের পানে সেদিন সকালে ছাড়া আর চাহিয়া দেখে নাই। ও-দিকে কুসুমও তাহার সহিত দেখা করিবার বা কথা কহিবার লেশমাত্র চেষ্টা করে নাই।

এমনি করিয়া এ-কয়টা দিন কাটিয়াছে, কিন্তু আর ত সময় নাই; তাই আজ বৃন্দাবন একজন দাসীকে ডাকিয়া, সে কবে যাইবে জানিতে পাঠাইয়া, বাইরে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

দাসী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, এখন তিনি যাবেন না।

বৃন্দাবন বিস্মিত হইয়া কহিল, এখানে আর ত থাকবার জো নেই, সে কথা বলে দিলে না কেন?

দাসী কহিল, বৌমা নিজেই সমস্ত জানেন।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে জেনে এসো, সে কি একলাই থাকবে?

দাসী এক মিনিটের মধ্যে জানিয়া আসিয়া কহিল, হাঁ।

বৃন্দাবন তখন নিজেই ভিতরে আসিল। ঘরের কপাট বন্ধ ছিল, হঠাৎ ঢুকিতে সাহস করিল না, ঈষৎ ঠেলিয়া ভিতরে চাহিয়াই তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। দগ্ধগৃহের পোড়া-প্রাচীরের মত কুসুম এইদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—চোখে তাহার উৎকট ক্ষিপ্ত চাহনি। আত্মগ্লানি ও পুত্রশোক কত শীঘ্র মানুষকে কি করিয়া ফেলিতে পারে, বৃন্দাবন এই তাহা প্রথম দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল।

অসাবধানে কপাটের কড়া নড়িয়া উঠিতেই কুসুম চাহিয়া দেখিল এবং সরিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল, ভেতরে এসো।

বৃন্দাবন ভিতরে আসিতেই সে দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হয়ত সে প্রকৃতিস্থ নয়, উন্মত্ত নারী কি কান্ড করিবে সন্দেহ করিয়া বৃন্দাবনের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু কুসুম অসম্ভব কাণ্ড কিছুই করিল না, গলায় আঁচল দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

বৃন্দাবন ভয়ে নড়িতে চড়িতে সাহস করিল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম বহুক্ষণ ধরিয়া ওই দুটি পায়ের ভিতর হইতে যেন শক্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল, বহুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া মুখপানে চাহিয়া বড় করুণ-কণ্ঠে বলিল, সবাই বলে, তুমি সইতে পেরেচ; কিন্তু আমার বুকের ভেতর দিবানিশি হুহু করে জ্বলে যাচ্চে, আমি বাঁচব কি করে? তোমাকে রেখে আমি মরবই বা কি করে?

দু'জনের এক জ্বালা। বৃন্দাবনের বিদ্বেষ-বহ্নি নিবিয়া গেল, সে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, কুসুম, আমি যাতে শান্তি পেয়েছি, তুমিও তাতে পাবে—সে ছাড়া আর পথ নেই।

কুসুম চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, চরণকে যে তুমি কত ভালবাসতে তা আমি জানি কুসুম। তাই তোমাকেও এ পথে ডাকছি। সে তোমার মরেনি, হারায়নি, শুধু লুকিয়ে আছে—একবার ভাল করে চেয়ে দেখতে শিখলেই দেখতে পাবে, যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে, আমাদের চরণও তাদের সঙ্গে আছে।

এতক্ষণে কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে আর-একবার নত হইয়া স্বামীর পায়ে মুখ রাখিল। ক্ষণকাল পরে মুখ তুলিয়া বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বৃন্দাবন সভয়ে বলিল, আমার সঙ্গে? সে অসম্ভব।

খুব সম্ভব। আমি যাব।

বৃন্দাবন উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, কি করে যাবে কুসুম, আমি তোমাকে প্রতিপালন করব কি করে? আমি নিজের জন্য ভিক্ষে করতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য ত পারিনে! তা ছাড়া তুমি হাঁটবে কি করে?

কুসুম অবিচলিত-স্বরে কহিল, আমিও খুব হাঁটতে পারি—হেঁটেই এসেছি। তা ছাড়া ভিক্ষে করতে তোমাকে আমি দেব না, তা সে আমার জন্যই হোক, আর তোমার নিজের জন্যই হোক। তুমি শুধু তোমার কাজ করে যেয়ো, আমি উপায় করতেও জানি, সংসার চালাতেও জানি। দাদার সংসার এতদিন আমিই চালিয়ে এসেছি।

বৃন্দাবন ভাবিতে লাগিল। কুসুম বলিল, ভাবনা মিছে। আমি যাবই। অবহেলায় ছেলে হারিয়েচি, স্বামী হারাতে আর চাইনে।

বৃন্দাবন আরও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল, চরণ আমার যে মন্ত্রে আমাকে দীক্ষিত করে গেছে, পারবে সেই মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করতে?

কুসুম শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, পারব।

তবে চল, বলিয়া বৃন্দাবন সম্মতি জানাইল এবং আর-একবার কেশবের উপর সমস্ত ভার তুলিয়া দিয়া সেই রাত্রেই স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া গেল।